KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮, সর্বানন্দ মাস্টার লেন, কলকাতা-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 1/1, 1/2-3, 1/4, 2/1	Year of Publication : July - Sep 1976, Jan - March 1977, Apr - Jun 1977, July - Sep 1977
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অশোক বক্সী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

৪

বিভাব

সম্পাদক/মণীশ নন্দী

বিভাব

UCOC-103 BEN

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা

১৩৮৪

বিশেষ রচনা

জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত কবিতা ১৭

১৯৩৬

প্রবন্ধ

কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়। শ্রীরাধারমণ মিত্র ১৮

সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা একেলা। নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৪৪

কবিতাগুচ্ছ

অরুণ মিত্রের কবিতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৬১

অরুণ মিত্রের একগুচ্ছ নতুন কবিতা ৭২

ব্যক্তিগত রচনা

প্রসঙ্গ : স্মৃতি। সমরেশ বসু ৭৬

প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শশধর তর্কচূড়ামণি। জ্যোতির্ময় বসু রায় ৮৩

শিল্পভাবনা

কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০

প্রবন্ধ

অভিধান প্রসঙ্গে। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০

ব্যক্তিগত রচনা

হে সমালোচক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১১১

আলোচনা

'আমারে ভুলিও প্রিয়'। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৭
ভীষ্মদেবের রেকর্ডের তালিকা। গৌরাঙ্গ ভৌমিক ১১৯
রবীন্দ্রনাথের বই। শিশিরকুমার দাশ ১২৩

প্রবন্ধ

দর্পণে বাঙালী। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১২৭

ব্যক্তিগত রচনা

তুষার রায় স্মরণে
লাল আগুনের মতো, লাল গোলাপের মতো। নিমাই চট্টোপাধ্যায় ১৩৪
তুষারের জন্য প্রথম ও শেষ কটি লাইন। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৩৮

সম্পাদক
মণীশ নন্দী

সম্পাদক মণ্ডলী : পবিত্র সরকার। কবিরুল ইসলাম।
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। প্রদীপ দাশগুপ্ত।
সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা-৭০০০১৭

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ
অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়েন্ট প্রোসেস

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলি-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত
এবং রাজধানী প্রিন্টিং, ১১৭/১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত।

বিশেষ রচনা

জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত কবিতা

১৯৩৬

সময়ের পথে-পথে ঘুরে ফেরে সারাদিন—তবু—তারপর—
ঘুমের সময় আসে অন্ধকারে—নদীদের ঢেউয়ের ভেতর

অনেক মাছের প্রাণে; চারিদিকে চেয়ে থাকে অগণন ঘাস
ধূসর পাখির মতো থেমে থাকে নক্ষত্রের নির্লিপ্ত আকাশ;

বাঁশের বনের পিছে মশার বিন্দুর ভিড়ে জেগে ওঠে চাঁদ।
মনে হয় সমস্ত থামিয়ে দিয়ে যেন এক মায়াবীর ফাঁদ

তারপর র'য়ে গেছে; রূপ প্রেম : সবই অন্ধকার;
সবই দীর্ঘ নিস্তব্ধতা; কঙ্কাল হবার—শূন্যে মিলিয়ে যাবার।

প্রবন্ধ

কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়

শ্রীরাধারমণ মিত্র

রামমোহন রায়ের কলিকাতায় অবস্থিতি

রামমোহন দেশ হইতে আসিয়া প্রথম কলিকাতায় অবস্থান করেন ১৭৯৭ সনের আগস্ট মাস হইতে ১৭৯৯ সনের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এইসময়ে তিনি বরাবর কলিকাতায় থাকেন নাই, মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য কলিকাতার বাহিরেও গিয়াছেন।

দ্বিতীয়বার তিনি কলিকাতায় থাকেন ১৮০০ সনের শেষ কিংবা ১৮০১ সনের প্রারম্ভ হইতে ১৮০৩ সনের মার্চ মাসের গোড়া পর্যন্ত। এই সময়ে তিনি ১৮০১ সনে সিভিলিয়ান মিঃ জন ডিগবির সহিত পরিচিত হন। এই সময়ে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান ফার্সী মুন্সী ও মৌলবীগণের সহিত যথেষ্ট মেলামেশা করিতেন।

উপরোক্ত দুইবার কলিকাতায় অবস্থানকালে রামমোহন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ান কর্মচারীদিগকে টাকা কর্জ দিবার ব্যবসা করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গোলকনারায়ণ সরকার নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার কেরানী ও গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক আর এক ব্যক্তিকে তহবিলদার বা খাজাঞ্চী নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি কোম্পানীর কাগজ কেনা বেচার ব্যবসাও করিতেন। ১৭৯৭ সনে তিনি মাননীয় এণ্ড্রু র‍্যামজে নামক এক সিভিলিয়ানকে ৭৫০০্ ও ১৮০২ সনে মিঃ টমাস উডফোর্ড নামক আর এক সিভিলিয়ানকে ৫০০০্ কর্জ দিয়াছিলেন।

১৮০৩ সনের জুন মাসে তিনি আবার কলিকাতায় আসেন এবং এখানেই ঐ সনের মে-জুন মাসে বর্দ্ধমান শহরে লোকান্তরিত পিতা রামকান্ত রায়ের

পারলৌকিক ক্রিয়া নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করেন। ১৮০৪ সনের প্রথম দিকে তিনি আবার কলিকাতা পরিত্যাগ করেন।

রংপুর ত্যাগ করিয়া রামমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ১৮১৪ সনের জুলাই মাসের শেষে কিংবা আগস্টের প্রথমদিকে। ১৮১৫ সনের মাঝামাঝি তাঁহাকে ভুটানে দৌত্য কার্যে যাইতে হয়। ভুটান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন ঐ সনের শেষাশেষি। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাসকালে তিনি বেনিয়ানের ব্যবসা অবলম্বন করেন। দীর্ঘ ১৫ বৎসর কলিকাতায় বাসের পর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন ১৯।১১।১৮৩০ তারিখে।

রামমোহনের পূর্ববর্তী কয়েকজন বিলাত যাত্রী

অনেকের ধারণা ভারতীয়দের কিংবা বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। এ ধারণা ভুল। সেখ ইহ্‌তেশাম্ উদ্দীন নামে একজন বাঙালী মুসলমান ১৭৬৫ সালে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স দেশে গমন করেন ও দেশে ফিরিয়া আসিয়া পারস্য ভাষায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন।

ইংলণ্ডে হেলিবেরি নামক স্থানে ভারতে চাকরি গ্রহণেচ্ছু সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজ নামে এক কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৮০৯ সনে। ঐ সনেই তিনজন ভারতীয় মুসলমান শিক্ষক হিসাবে ঐ কলেজে যোগদান করেন। তাঁহাদিগের নাম মৌলবী আব্দুল আলী, মৌলবী মির্জা খলিল ও মুন্সী গোলাম হায়দার। প্রথম দুইজন ছিলেন কলেজের প্রাচ্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও তৃতীয়জন ছিলেন আরবী ও ফার্সী লিপি শিক্ষক। এই তিনজনের ইংলণ্ডে চাকরির কাল যথাক্রমে ১৮০৯—১৮১২, ১৮০৯—১৮১৯ ও ১৮০৯—১৮২৩ খৃঃ। চতুর্থ একজন ভারতীয় মুসলমান মির্জা মহম্মদ ইব্রাহিম ঐ কলেজে ১৮২৬ হইতে ১৮৪৪ সন পর্যন্ত আরবী ও ফার্সী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।

যদি বলা হয় রামমোহন রায় ভারতীয় বা বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে প্রথম বিলাত যাত্রী, সে কথাও ঠিক নয়। রামমোহনের প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে বোম্বাইয়ের দুইজন ব্রাহ্মণ বিলাত গিয়াছিলেন। গণেশ দাস নামক একজন বাঙালী হিন্দু ১৭৬৫ সনে কিংবা তাহার কিছু পরে ইউরোপ গমন করেন। ১৭৭৪ সনে কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে গণেশ দাস ঐ কোর্টের ফার্সী অনুবাদক

নিযুক্ত হন। ১৭৭৫ সনের জুন মাসে তিনি রেডারেও কিয়ারনাণ্ডারের নিকট খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা

(১) রামমোহন রায়ের দাদা ৺জগমোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়, ২৩।৬।১৮১৭ তারিখে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টের একুইটি বিভাগে রামমোহনের বিরুদ্ধে এক মোকর্দ্দমা রুজু করেন। তাহাতে তিনি রামমোহন রায়ের সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দাবী করেন এই বলিয়া যে রামমোহনের ও তাঁহার পিতার সম্পত্তি যৌথ সম্পত্তি ছিল। বিচারের শেষ দিনে বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে উপস্থিত না থাকায় প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট ১০।১২।১৮১৯ তারিখে মায় খরচ খরচা মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দেন।

(২) ঐ জগমোহন রায়ের বিধবা পত্নী ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মাতা দুর্গাদেবী ১৩।৪।১৮২১ তারিখে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের একুইটি বিভাগে এক মোকর্দ্দমা দায়ের করেন। তাহাতে তিনি রামমোহনের রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর নামে দুই তালুক নিজের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন এই অজুহাতে যে এই দুই সম্পত্তি রামমোহন বাদীর নিকট হইতে ৪৫০০৲ কর্জ করিয়া খরিদ করেন। ৩০।১১।১৮২১ তারিখে খরচ খরচা সমেত মোকর্দ্দমা খারিজ হইয়া যায়।

(৩) ১৬।৬।১৮২৩ তারিখে বর্দ্ধমানাধীশ মহারাজা তেজচন্দ্র রামমোহন ও গোবিন্দ প্রসাদ রায়ের বিরুদ্ধে কলিকাতার প্রভিন্সিয়াল কোর্টে ১২,৬০৪৲, ৫৬,৮০৭৲ ও ১৫,২০০৲ দাবী করিয়া তিনটি মামলা রুজু করেন, রামমোহনের স্বর্গীয় পিতার স্বাক্ষরিত তিনটি কিস্তিবন্দী খতের বলে। খরচ খরচা সমেত মামলা তিনটি খারিজ হইয়া যায়। মহারাজা তেজচন্দ্র সদর দেওয়ানী আদালতে আপিল করেন। সে আপিলও খরচা সমেত খারিজ হইয়া যায়। প্রথম মোকর্দ্দমাটি খারিজ হয় ১০।১১।১৮৩০ তারিখে ও শেষ দুটি ১০।১১।১৮৩১ তারিখে।

(৪) শেষ মোকর্দ্দমা হয় রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের বিরুদ্ধে। বর্দ্ধমান কালেকটারীতে নায়েব সেরেস্তাদারের পদে অস্থায়ীরূপে কার্য করিবার সময় রাধাপ্রসাদ সরকারী তহবিল তছরূপ করিয়াছিলেন এই অভিযোগে তাঁহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হয়। মোকর্দ্দমা ১৮২৫ ও ১৮২৬ এই দুই বৎসর চলে। শেষে রাধাপ্রসাদ নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ সে যন্ত্রণা ও নির্যাতন পুত্রকে ভোগ করিতে হয় তাহার ফলে পিতা রামমোহনের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ হয়।

কলিকাতায় রামমোহনের বাটী

বিভিন্ন সময়ে কলিকাতায় রামমোহনের নাকি চারিখানি বাড়ী ছিল, যথা—(১) সম্পত্তি বিভাগের সময় তিনি পিতার নিকট হইতে জোড়াসাঁকোয় একখানি বাড়ী পাইয়াছিলেন; (২) ও (৩) ১৮১৪ সনে রংপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন দুইখানি বাড়ী খরিদ করেন। প্রথমটি চৌরঙ্গীতে হাতাসুদ্ধ একটি দ্বিতল বাটী। এটি শ্রীমতী এলিজাবেথ ফেনউইক নাম্নী এক মহিলার নিকট হইতে তিনি ২০,৩১৭ টাকায় ক্রয় করেন। দ্বিতীয় বাড়ীটি ক্রয় করেন সিমলায় ফ্রান্সিস মেণ্ডিস নামে এক সাহেবের নিকট হইতে ১৩,০০০ টাকায়। (৪) চতুর্থ বাড়ীটি ছিল তাঁহার বিখ্যাত মাণিকতলার উদ্যানবাটী, যেটি তিনি নাকি তাঁহার জ্ঞাতি ভাই রামতনু রায়ের দ্বারা সাহেবী ধরনে তৈয়ারি ও সজ্জিত করাইয়াছিলেন।

এই শেষোক্ত বাড়ীটির উপরতলায় ছিল তিনটি বড় হল, ছয়টি কামরা, দুইটি বারান্দা ও নীচের তলায় অনেকগুলি কুঠরী ছিল। আর ছিল গুদাম, বাবুর্চিখানা, আস্তাবল প্রভৃতি। আরো ছিল নানাপ্রকার ফলের গাছ ও তিনটি বড় পুষ্করিণী সমেত ১৫ বিঘা জমির একটি বাগান। এই বাগানবাড়ীতে রামমোহন সাড়ম্বরে বাস করিতেন এবং তাঁহার দেশী ও বিদেশী বন্ধুগণকে খানাপিনায় ও নাচ গানে আপ্যায়িত করিতেন। বিদেশী পরিব্রাজকগণের মধ্যে ফিট্‌স ক্লারেন্স (আর্ল অব মান্‌ষ্টার), ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকমঁ ও ইংরাজ মহিলা ফ্যানী পার্কস এই বাড়ীতে রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শেষোক্ত ইংরাজ মহিলা তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ১৮২৩ সনের মে মাসে রামমোহনের এই বাগানবাড়ীতে একটি উৎসবের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বাড়ীর বড় হাতার মধ্যে খাসা রোশনাই ও দিব্য আতসবাজী পোড়ান হইয়াছিল। বাড়ীর প্রতিটি ঘরে নাচওয়ালীরা নাচগান করিতেছিল। এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকীও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য জগতের 'কাটালানী' বলা হইত।" এই বাড়ীটি বর্তমানে ১১৩ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ী। কলিকাতা পুলিশের উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের আপিস এই বাড়ীতে।

(১) ও (২) নং বাড়ী অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ী ও চৌরঙ্গীর খরিদা বাড়ী আজ পর্যন্ত সনাক্ত করিতে পারা যায় নাই।

বাকি রহিল সিমলার বাড়ী। বলা হয় এটি রামমোহনের ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাসগৃহ। এই বাটীর গাত্রে একটি মর্ম্মর ফলকে ইংরাজীতে লিখিত আছে—

"এই বাড়ীতে রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাস করিয়াছিলেন।" পাথরের উপর লিখিত হইলেও এই লেখাটি এই ব্যাপারে 'পাথুরে প্রমাণ' নয় যে রামমোহন এই বাড়ীতে বাস করিতেন অথবা এই বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, রামমোহন এই বাড়ীতে একদিনও যে বাস করিয়াছিলেন তাহার আদৌ কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার জীবনের কোন ঘটনাই এই বাড়ীতে ঘটে নাই। তাঁহার সম্বন্ধে যাঁহারাই কিছু লিখিয়াছেন তাঁহারাই মাণিকতলার বাগান বাড়ীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, মেণ্ডিস সাহেবের নিকট হইতে খরিদ করিয়া থাকিলে এই বাড়ীও সাহেবী ধরনের বাড়ী হইত। কিন্তু এই বাড়ী আদৌ সাহেবী ধরনের নয়, সম্পূর্ণ বাঙালী ধরনের বাড়ী। তৃতীয়তঃ, ঐ বিশাল অট্টালিকা ও সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সেই যুগেও মাত্র ১৩,০০০ টাকায় পাওয়া সম্ভব ছিল না। চতুর্থতঃ, ১৮১৪-১৮১৫ সনে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট নামক রাস্তাই হয় নাই। হইয়াছে ১৮২৩-১৮২৪ সনে। সুতরাং যখন রাস্তাই ছিল না তখন রাস্তার ধারে দুইটি প্রধান ফটক নির্মাণ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা বোধগম্য নয়।

সেইজন্য ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন মাণিকতলার বাগান বাড়ীই সিমলার বাড়ী, ফ্রান্সিস মেণ্ডিস সাহেবের নিকট হইতে ক্রয় করা (সেই জন্য সাহেবী ধরনে নির্মিত ও সজ্জিত—রা. মি.)। ঐ বাড়ীকে যেরূপ মাণিকতলার বাড়ী বলা হয় সেইরূপ সিমলার বাড়ীও বলা যাইতে পারে। কারণ ঐ বাড়ী প্রায় সুকিয়া স্ট্রীটের সংলগ্ন এবং সুকিয়া স্ট্রীটের সেকালে নাম ছিল 'বাহির সিমলা'। এই বাড়ী বিক্রয়ের যে বিজ্ঞাপন ৯।১।১৮৩০ তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতেও বলা হইয়াছিল, "অপার সার্কুলার রোড সিমলার মাণিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান"।

তৎসত্ত্বেও যদি মাণিকতলার বাড়ীকে সিমলার বাড়ী বলিয়া স্বীকার করিতে একান্তই আপত্তি হয়, তাহা হইলে ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাড়ীর বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্বদিকে রামমোহন এক বাড়ী খরিদ করিয়া থাকিতে পারেন। সেইটিকে হয়ত রামমোহনের সিমলার বাড়ী বলা হইত। ১৮৫৭ সনের কলিকাতার ডিরেক্টারীতে আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের পূর্বদিকে তখনকার ৪৮ নং বাড়ীটি, সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল মিঃ রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ী বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঐ বাড়ী কে করিয়াছিলেন—রামমোহন রায় না রমাপ্রসাদ রায় তাহা জানিবার উপায় নাই। ঐ ডিরেক্টারী অনুসারে ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের জমির

উপর কাহারও বাড়ী ছিল না, রামমোহনের তা নয়ই। তখন ঐ জায়গাটার নম্বর ছিল ৬০ আর সেখানে একটি লবণের চৌকি ছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাড়ী সম্বন্ধে ৺তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (যিনি নিজে রামমোহন রায়ের পৌত্রীর প্রপৌত্র সুতরাং ঐ বংশেরই সন্তান) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন "সত্যই কি ঐ বাড়ী রামমোহনের বাড়ী?" এবং মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "রামমোহনের আত্মীয় স্বজন ও বংশধরদের মধ্যে এই কথাই প্রচলিত আছে যে বাড়ীটি প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের, রামমোহনের মৃত্যুর অনেক পরে তিনি ঐ বাড়ী তৈয়ারি করেন।" তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, "একথার একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ১৮৫২ সনে মারা যাইবার পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় রাধাপ্রসাদের ওয়ারিশানদিগের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে পৈতৃক যৌথ বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার এক মামলা দায়ের করেন। ঐ মামলায় যৌথ সম্পত্তির যে ফর্দ দাখিল করা হইয়াছিল তাহাতে ঐ বাড়ীর কোন উল্লেখ ছিল না।" তপনমোহনের জীবদ্দশায় তাঁহার কথার খণ্ডন বা প্রতিবাদ কেহই লিখিত ভাবে করেন নাই। তপনমোহন পরোক্ষ প্রমাণের কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা জানিতেন না। তাঁহার কথা শুনিয়াই আমার এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের স্পৃহা জাগে। ফলে আমি ১৮৫৭ সনের ডিরেক্টারীতে তপনমোহনের উক্তি যে যথার্থ তাহার প্রমাণ পাই। শুধু ১৮৫৭ সনের ডিরেক্টারীই নয়, প্রায় সমসাময়িক একটি কলিকাতার মানচিত্র হইতেও ঐ একই কথা প্রমাণিত হয়। ১৮৪৭-৪৯ সনে এফ. ডবলিউ সিমসের মানচিত্রে ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের স্থলে কতকগুলি একতলা কাঁচা বাড়ী দেখানো আছে। একটিও পাকা দোতলা বা তিনতলা বাড়ীর চিহ্ন মাত্র নাই। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে ১৮৫৭ হইতে ১৮৬২ সনের মধ্যে কোনও একসময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান সরকারী উকিল প্রভূত বিত্তশালী রমাপ্রসাদ রায় বর্তমান ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তৎপূর্বে তিনি পূর্বদিকের সামান্য একটি বাড়ীতে বাস করিতেন। ঐ বাড়ীটি দীর্ঘকাল যাবৎ রায় বাবুদের কাছারি বাড়ী বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

পরিশেষে বক্তব্য হে'দুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে যে বাড়ীতে রামমোহনের এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল বসিত সেই বাড়ীটি কলিকাতায় রামমোহনের চারিটি বাড়ীর মধ্যে কেহ গণ্য করেন নাই। অথচ ৬।১০।১৮৩৯ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত

তত্ত্ববোধিনী সভার বিবরণে পাইতেছি যে, "এই সভার অধিবেশন হইত প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তাহার পর সিমুলিয়াস্থ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের, তাহার পর হেদুয়ার দক্ষিণস্থ রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে এবং সর্বশেষে সমাজ গৃহে স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে রমানাথ ঠাকুরের ভবনে।" ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই বাড়ীটি রামমোহনেরই ছিল। অতএব এই বাড়ীও তাঁহার সিমলার বাড়ী হইতে পারে।

রামমোহন কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন :—

(১) The Brahmunical Magazine or the Missionary and the Brahmun, Nos. I. II. and III—ব্রাহ্মণ সেবধি : ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সংবাদ (সংখ্যা ১,২,৩)—১৮২১।
প্রথম তিন সংখ্যা বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই ১৮২১ সনে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংখ্যা শুধু ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়—১৫।১১।১৮২৩ তারিখে।

(২) সম্বাদ কৌমুদী (সাপ্তাহিক)—৪।১২।১৮২১

(৩) মীরাৎ-উল-আখবার (বাংলাদেশে পারস্য ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক)—১২।৪।১৮২২
শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৪।৪।১৮২৩ তারিখে। ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইত।

(৪) ৯।৫।১৮২৯ হইতে ৩০।৭।১৮২৯ তারিখ পর্যন্ত রামমোহন রায় Bengal Herald-এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

রামমোহন কলিকাতায় নিম্নলিখিত সভাগুলি প্রতিষ্ঠা করেন :—

(১) আত্মীয় সভা—মার্চ, ১৮১৫

(২) ইউনিটেরিয়ান কমিটি—সেপ্টেম্বর, ১৮২১

(৩) ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ—২০।৮।১৮২৮ তারিখে (বাংলা ৬ই ভাদ্র)
জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়ীর ভাড়া করা দুইখানি বাহিরের ঘরে। ঐ বাড়ীর বর্তমান নম্বর ২২৮ আপার চীৎপুর রোড।

(৪) জোড়াসাঁকোর নিজস্ব গৃহে (৫৫।১ নং আপার চীৎপুর রোড) ব্রাহ্মসমাজ স্থানান্তরিত হয়—২৩।১।১৮৩০ তারিখে। (বাংলা ১১ই মাঘ)

রামমোহন কলিকাতায় নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত করেন :—

(১) হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮২২ সনে।

মিঃ উইলিয়াম এ্যাডাম এই স্কুলের দুইজন পরিদর্শকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 'ক্যালকাটা জার্নালে'র সহকারী সম্পাদক এবং বিলাতে রামমোহন রায়ের সেক্রেটারী মিঃ স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এই স্কুলে চারিটি শ্রেণী ছিল। ১৮২৭ সনে এই স্কুলে মাত্র দুইজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের বেতন ছিল মাসিক ১৫০৲ এবং দ্বিতীয় জনের ৭০৲। ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬০ হইতে ৮০। ১৮২৮ সনে রামমোহনের সহিত মতভেদ হওয়ায় মিঃ এ্যাডাম এই স্কুলের পরিদর্শকের পদ ত্যাগ করেন। ১৮২৮ ও ১৮২৯ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৮৩০ সনে বিলাত যাত্রাকালে রামমোহন প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মিত্রের উপর এই স্কুল পরিচালনার ভার দিয়া যান। পূর্ণচন্দ্র মিত্র এই স্কুলের নাম পরিবর্তন করিয়া ইণ্ডিয়ান একাডেমি রাখেন। নবীনমাধব দে বা দেব প্রথমে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে শিক্ষক হন। প্রধান শিক্ষকের সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়ায় তিনি এই স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজে একটি স্বতন্ত্র স্কুল স্থাপন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৩৭ সনে পূর্ণচন্দ্র মিত্রের ইণ্ডিয়ান একাডেমিতে এক বৎসর ও ১৮৩৮ সনে নবীনমাধব দের স্কুলে প্রায় এক বৎসর পাঠ করেন।

(২) সংস্কৃত কিংবা বাঙলা ভাষায় বেদান্ত তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য রামমোহন ১৮২৬ সনের জুন বা জুলাই মাসে বেদান্ত কলেজ স্থাপিত করেন।

জেনারেল এ্যাসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউশন স্থাপনে রামমোহনের সাহায্য

পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ ২৭।৫।১৮৩০ তারিখে কলিকাতায় আসিয়া একটি ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে দেশী পাড়ায় একটি বাড়ীর সন্ধান করিতেছিলেন কিন্তু পাইতেছিলেন না। রামমোহনকে ধরিলে রামমোহন তাঁহাকে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ীর বাহিরের দুইখানি খালি ঘর—যেখানে পূর্বে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ ভাড়া ছিল—ডাফ সাহেবকে পূর্বাপেক্ষা কম ভাড়ায় সংগ্রহ করিয়া দেন। নিজের বন্ধুদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাদের পুত্রগণকে ডাফের স্কুলের

প্রথম ছাত্ররূপে সংগ্রহ করিয়া দেন। প্রথমে মাত্র পাঁচজন ছাত্র পাওয়া গিয়াছিল। ডাফ সাহেব এই পাঁচটি ছাত্র লইয়া ঐ দুইখানি ভাড়া ঘরে ১৩।৭।১৮৩০ তারিখে তাঁহার স্কুল জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা দিবসে রামমোহন প্রথম হইতেই উপস্থিত ছিলেন। ডাফ সাহেব বাইবেল হইতে 'প্রভুর প্রার্থনা' আবৃত্তি করিলেন। তাহাতে কাহারো আপত্তি হইল না। কিন্তু তাহার পর যখন তিনি ছাত্রগণের হস্তে বাইবেল দিয়া তাহাদের পড়িতে বলিলেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে আপত্তিসূচক মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। রামমোহন তখন ছাত্রদিগকে বলিলেন, "ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসনের মত খ্রীষ্টান সমগ্র হিন্দু শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনি হিন্দু হন নাই। আমি নিজে সমগ্র কোরাণ বারম্বার পাঠ করিয়াছি তাহার ফলে আমি কি মুসলমান হইয়া গিয়াছি? আমি সমগ্র বাইবেল আগাগোড়া পাঠ করিয়াছি কিন্তু তোমরা জান আমি খ্রীষ্টান হইয়া যাই নাই। তাহা হইলে তোমরা বাইবেল পড়িতে ভয় পাইতেছ কেন? উহা পাঠ কর ও নিজেরাই বিচার করিয়া দেখ।"

এই কথা শুনিয়া আপত্তিকারীরা নীরব হইল। ইহার পর রামমোহন পরবর্তী পুরা দেড় মাস কাল প্রতিদিন সকাল দশটায়—যখন বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হইত—ডাফের স্কুলে উপস্থিত থাকিয়াছেন। পরেও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতেন।

এই সূত্রে উল্লেখ্য যে চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের প্রথম মিশনারিরূপে ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডাফকে কলিকাতায় আনাইবার ব্যাপারে রামমোহনেরও কিছু হাত ছিল। রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়া চার্চ অব ইংল্যাণ্ড ও ব্যাপটিস্ট্ চার্চের সহিত তাঁহার বনিবনা হইত না। কারণ এই দুটি চার্চ ত্রীশ্বরবাদী। কিন্তু চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড বা প্রেসবিটিরিয়ান চার্চ ত্রীশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও রামমোহন এই চার্চের পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকি কলিকাতায় সেণ্ট এণ্ড্রুজ চার্চের তিনি মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন। এই গীর্জায় যাইয়া উপাসনা করিতেন। এই গীর্জার পাদরী ডক্টর ব্রাইস ১৮২৪ সনে স্কটল্যাণ্ডে জেনারেল এ্যাসেমব্লির নিকট ব্রিটিশ ভারতে একজন মিশনারি পাঠাইবার জন্য আবেদন পাঠান। তৎপূর্বে ৮।১২।১৮২৩ তারিখে রামমোহন ডক্টর ব্রাইসের ঐ আবেদন লিখিতভাবে সমর্থন করেন।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের বাংলা রচনাবলী :—

১) বেদান্তগ্রন্থ —১৮১৫
২) বেদান্ত সার —১৮১৫

৩) তলবকারোপনিষদ্ (কেনোপনিষৎ) —জুন, ১৮১৬
৪) ঈশোপনিষদ্ —জুলাই, ১৮১৬
৫) ভট্টাচার্যের সহিত বিচার —মে, ১৮১৭
৬) কঠোপনিষদ —আগস্ট, ১৮১৭
৭) মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ —অক্টোবর, ১৮১৭
৮) গোস্বামীর সহিত বিচার —জুন, ১৮১৮
৯) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ —নভেম্বর, ১৮১৮
১০) গায়ত্রীর অর্থ —১৮১৮
১১) মুণ্ডকোপনিষদ্ —মার্চ, ১৮১৯
১২) শঙ্করাচার্যের 'আত্মানাত্ম' বিবেক'এর বাংলা অনুবাদ —১৮১৯ (?)
১৩) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ—নভেম্বর, ১৮১৯
১৪) কবিতাকারের সহিত বিচার —১৮২০
১৫) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার —১৮২০
১৬) চারি প্রশ্নের উত্তর —মে, ১৮২২
১৭) প্রার্থনাপত্র —মার্চ, ১৮২৩
১৮) পাদরি ও শিষ্য সংবাদ —১৮২৩ (?)
১৯) গুরু পাদুকা —১৮২৩ (অপ্রাপ্য)
২০) পথ্য প্রদান —ডিসেম্বর, ১৮২৩
২১) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ —১৮২৬
২২) কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার —১৮২৬
২৩) বজ্রসূচী (১ম নির্ণয়) —১৮২৭
বৌদ্ধ বজ্রসূচী উপনিষদের বঙ্গানুবাদ
২৪) ব্রহ্মোপাসনা —১৮২৮
২৫) ব্রহ্মসঙ্গীত —১৮২৮
২৬) অনুষ্ঠান —১৮২৯
২৭) সহমরণ বিষয়ে —১৮২৯
২৮) গৌড়ীয় ব্যাকরণ —১৮৩৩
২৯) ভগবদ্গীতার পদ্যে (অনুবাদ) (অপ্রাপ্য)

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী :—

১) উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার — ১৮১৬-১৭
(তিনখানি পুস্তিকা)

২) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার — ১৮২০

৩) গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানং — ১৮২৭

৪) ক্ষুদ্রপত্রী
(উপনিষদের দুইটি শ্লোক ও রামমোহন বিরচিত দুইটি শ্লোক)
প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের হিন্দি গ্রন্থাবলী :—

১) বেদান্ত গ্রন্থ — ১৮১৫ (?) (অপ্রাপ্য)
(বাংলা বেদান্ত গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদ)

২) বেদান্তসার — ১৮১৫ (?) (অপ্রাপ্য)
(বাংলা বেদান্ত সারের হিন্দি অনুবাদ)

৩) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার — ১৮২০
(সংস্কৃত পুস্তিকার হিন্দি অনুবাদ)

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের ইংরাজি গ্রন্থাবলী :—

১) Translation of an Abridgement of the Vedant or Resolution of all the Veds—1816.

২) Translation of the Cena Upanishad—1816.

৩) Translation of the Ishopanishad—1816.

৪) A Defence of Hindoo Theism—1817.

৫) A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas—1817.

৬) Counter petition of the Hindu Inhabitants of Calcutta against Suttee—1818.
(রামমোহনের রচনা বলিয়া প্রচলিত)

৭) Translation of a Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of Burning Widows Alive, from the original Bungla—1818.

৮) Translation of the Moonduk Opunishud—1819.

৯) Translation of the Kut'h-Opunishud—1819.

১০) An Apology for the pursuit of Final Beatitude, independentedly of Brahmunical Observances—1820.
(সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচারের অনুবাদ)

১১) A Second Conference between an Advocate for, and an opponent of, the practice of Burning widows Alive—1820
(Translated from the original Bengalee)

১২) The precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness, with translations into Sungscrit and Bengali—1820
(But these translations were never published by Rammohan)

১৩) An Appeal to the Christian Public in Defence of precepts of Jesus—1820

১৪) Second Appeal to the Christian Public in Defence of Precepts of Jesus—1821.

১৫) Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance—1822.

১৬) Final Appeal to the Christian Public in Defence of Preceipts of Jesus—1823.

১৭) Humble Suggestions to his Countrymen who beleive in one True God—1823.

১৮) Petitions against the Press Regulations
(a) Memorial to the Supreme Court—1823.
(b) Appeal to the King in Council—1823 (? 1825)

১৯) A few Queries for the Serious Considerations of Trinitarians Parts I and II—1823.

২০) A Dialogue between a Missionary and three Chinese Converts—1823.
(পাদরি ও শিষ্য সংবাদের ইংরাজী অনুবাদ)

২১) A Vindication of the Incarnation of the Deity as a

common basis of Hinduism and Christianity against the Schismatic attacks of R. Tytler, Esqur, M. D.—1823.

২২) A Letter to Lord Amherst on Western Education dated 11.12.1823.

২৩) A Letter to the Revd. Henry Ware on the prospects of Christinity in India—1824.

২৪) Translation of a Sanskrit Tract on Different Modes of Worship—1825.

২৫) Bengalee Grammer in English Language – 1826.

২৬) A Translation into English of Sanskrit Tract, including the Divine Worship—1827.

২৭) Translation into English of the Sanskrit Tract গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানম্—1827.

২৮) Answer of a Hindoo to the question "Why do you frequent Unitarian Places of Worship instead of the numerously attended Established Churches ?"—1827.

২৯) Symbol of the Trinity—1828 (?)

৩০) The Universal Religion—1829.

৩১) Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands—1829.

৩২) Petition of the Padishah (Akbar II) of Delhi to King George IV of England—1829.

৩৩) Address to Lord William Bentinck, Governor General of India, upon the passing of the Act for the abolition of Suttee—1830.

৩৪) Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property according to the Law of Bengal—1830.

৩৫) Letters on Hindu Law of Inheritance – 1830

৩৬) Abstract of Arguments regarding the burning of widows considered as a religious rite—1830.

৩৭) Counter-petition to the House of Commons to the Memorial of the Advocates of the Suttee—1830.

৩৮) On the Possibility, Practicability and Expediency of Substituting the Bengali Language for the English.

রচনাকাল অজ্ঞাত। রামমোহনের জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত।

৩৯) Hindu Authorities in favour of slaying the Cow and eating its flesh.

রচনাকাল অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত।

[৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়' ও কুমারী সোফিয়া ডবসন কোলেটের "দি লাইফ এণ্ড লেটারস অব রাজা রামমোহন রায়"-এর সাহায্যে এই গ্রন্থপঞ্জী সংকলিত।]

রাজা রামমোহন রায়ের বংশলতা

২৩ শ্রীবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পৌরোহিত্য আদি কুল ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া নবাব সরকারের উচ্চপদে কর্ম করিতেন)

২৪ (কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) রায়

(নবাব সরকার হইতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ জিলার শাকা গ্রামে। বিষয়কর্ম উপলক্ষে হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া স্থানটি খুব পছন্দ হওয়ায় মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাধানগরে নবাব সরকারের খাস জমিতে গৃহ নির্মাণ করিয়া বসবাস করেন। নবাব কর্তৃক বর্দ্ধমান রাজ জগৎরাম রায়ের একজন প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন।)

২৫ অমরচন্দ্র রায় — হরিপ্রসাদ রায় — ব্রজবিনোদ রায়

ব্রজবিনোদ রায়: মৃত্যু ১৭৬৮ সনে

(আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে তাঁহার বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম যখন পূর্বদেশে ছিলেন, তখন ব্রজবিনোদ তাঁহার অধীনে কর্ম করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।)

ব্রজবিনোদ রায়

২৬ ১ নিমানন্দ রায় — ২ রামকিশোর রায় — ৩ রাধামোহন রায় — ৪ গোপীমোহন রায় — ৫ রামকান্ত রায় — ৬ রামরাম রায় — ৭ বিষ্ণুরাম রায়

(ইহারা সকলে রাধানগরের পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিলেও পৃথগন্ন ছিলেন। প্রত্যেকের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিও স্বতন্ত্র ছিল।)

২৭ নবকিশোর রায়

২৮ শ্রীনাথ রায়

২৯ গোপীনাথ রায়

৩০ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি

(সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও হ্যানিম্যানের জীবনীকার, শেষ জীবনে হাওড়া-ব্যাঁটরা স্কুলের শিক্ষক। 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন ও পরহিত' মাসিক পত্রের সম্পাদক। জন্ম—২৭।৩।১৮৫৪ ; মৃত্যু—১৮।১১।১৯১২)

২৬ রামকান্ত রায়

মৃত্যু—মে-জুন ১৮০৩

রাধানগরের পৈতৃক ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করেন। ইহার তিন বিবাহ। প্রথমা পত্নী সুভদ্রাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী তারিণীদেবী (ফুল ঠাকুরাণী) চাতরার শ্যাম ভট্টাচার্য ওরফে

দেশগুরু ভট্টাচার্যের কন্যা। ইনি ১৮২০ সনে শ্রীক্ষেত্রে একাকী যাত্রা করেন ও ২১।৪।১৮২২ তারিখে শ্রীক্ষেত্রেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তৃতীয়া পত্নী রামমণি দেবী রামশঙ্কর রায়ের কন্যা।

২য়া পত্নী তারিণীদেবীর গর্ভে

২৭ কন্যা
=শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

২৮ গুরুদাস মুখোপাধ্যায়

জগমোহন রায়
মৃত্যু-মার্চ-এপ্রিল ১৮১২।
ইঁহারও তিন বিবাহ।
এক পত্নীর নাম দুর্গাদেবী।
ইঁহার গর্ভে

২৮ গোবিন্দপ্রসাদ রায়
জন্ম—১৭৯৭ সন

২৯ শ্রীপতি

৩০ ভূপতি
ক্ষিতিপতি

৩১ শচীপতি

(রাজা) রামমোহন রায় জন্ম—১৬।৫।১৭৭৪। ইঁহার জন্মের বিভিন্ন বৎসরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিকাংশের মতে ১৭৭৪ সাল। মৃত্যু—২৭।৯।১৮৩৩ ইংল্যাণ্ডের বৃস্টল নগরে। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ইঁহারও তিন বিবাহ। ইঁহার যখন মাত্র ৮ বৎসর বয়স তখন ইঁহার প্রথমা স্ত্রীর (নাম অজ্ঞাত) মৃত্যু হয়। পরবৎসর বর্দ্ধমান জেলার কুড়মন পলাশী গ্রামের শ্রীমতী দেবীর সঙ্গে পিতা ইঁহার বিবাহ দেন। অল্পদিন পরে দ্বিতীয়া পত্নী বর্তমান থাকিতেই কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী উমাদেবীর সহিত পিতা ইঁহার বিবাহ দেন। উমাদেবীর সন্তানাদি হয় নাই। রামমোহন লাঙ্গুলপাড়ার পৈতৃক বাটী ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামে নিজস্ব বাটী নির্মাণ করেন।

৩য়া পত্নী রামমণি দেবীর গর্ভে

২৭ রামলোচন রায়
১৮১৩ সনের পূর্বে মৃত্যু।
অপুত্রক।

২৭ রামমোহন রায়
=শ্রীমতী দেবী

২৮ রাধাপ্রসাদ রায়
জন্ম—১৮০০ সনের শেষে কিংবা ১৮০১ সনের প্রথমে।
মৃত্যু—কলিকাতায় ৯।৩।১৮৫২ তারিখে।
কলিকাতায় ও কৃষ্ণনগরে কর্ম করিতেন।

রায় বাহাদুর
রমাপ্রসাদ রায়
জন্ম—রঘুনাথপুরে ২৮।৭।১৮১৭
মৃত্যু—কলিকাতায় ১।৮।১৮৬২

পিতার এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে, পেরেণ্ট্যাল একাডেমিক ইনষ্টিটিউশনে এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষা। ১৮৩৮ সনে ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত। ১৮৪৫ সনে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ। ১৮৫০ সনের আগষ্ট মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুর অবসর গ্রহণ করিলে রমাপ্রসাদ তাঁহার শূন্যস্থলে সদর দেওয়ানী আদালতের সরকারী

২৮ =হুগলী জেলার
ইড় পাড়া গ্রামের
জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির
কন্যা
|
কন্যা
২৯ চন্দ্রজ্যোতি
=শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়

উকিল নিযুক্ত। ১৮৬১ সনের মধ্যভাগে মিঃ বোফোর্টের স্থানে লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার নিযুক্ত। ১৮৬২ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত। ইহার প্রথমা স্ত্রী অতি অল্প বয়সেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে ৺মৃত্যুঞ্জয় আগমবাগীশের কন্যা দ্রবময়ীকে বিবাহ করেন। নব প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিচারাসনে বসিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে স্বোপার্জিত ২২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ করেন হিন্দুমতে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে মৌখিক সমর্থন জানাইয়াও প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করিতে অস্বীকার করেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় রমাপ্রসাদের ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো রামমোহন রায়ের ছবিটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন "ওটা নামিয়ে ফেল"। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

৫

২৮ রমাপ্রসাদ রায়
=দ্রবময়ী দেবী
|
২৯ হরিমোহন রায়
জন্ম—মে-জুন, ১৮৪৮
মৃত্যু—২২।৩।১৮৯৭

প্যারীমোহন রায়
জন্ম—অক্টোবর-নভেম্বর, ১৮৫০
মৃত্যু—১২।৬।১৯৪৮

বিভাব

অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। শখের যাত্রার দল ও সুন্দর পশুশালা করেন। বিলাসিতার জন্য বিষয় সম্পত্তি অনেক নষ্ট করেন।
=গোলাপসুন্দরী
|
৩০ কন্যা
হরিমোহন অপুত্রক হওয়ায় তাঁহার কন্যার বংশধরগণ মাতামহের অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'ন।

খুব বলবান, সঙ্গীতের অনুরাগী ও উৎকৃষ্ট বাদক ছিলেন। অপুত্রক।

৩০ ধরণীমোহন রায়
(পোষ্যপুত্র)
মৃত্যু—২৫।৭।১৯৭০, ৮৩ বৎসর বয়সে।
=হেতমপুরের মহারাজ কুমার নিরঞ্জন চক্রবর্তীর কন্যা প্রমোদবালা দেবী, এখনো জীবিতা, বর্তমান বয়স ৭৩ বৎসর।

৩১ ৺সবিতামোহন রায়
১৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

শচীন্দ্রমোহন রায়
মৃত্যু—১২।১২।১৯৭০
৪৯ বৎসর বয়সে।
=আরতিরাণী দেবী জীবিতা, বর্তমান বয়স ৪০ বৎসর।

৩২ কন্যা
বিবাহিতা
বয়স ২৮ বৎসর

পুত্র
অবিবাহিত

কন্যা
বিবাহিতা

পুত্র
অবিবাহিত
বয়স ২০ বৎসর

৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাড়ী বিক্রি হইয়া গিয়াছে।

৬

রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের শাখা

২৮ রাধাপ্রসাদ রায়

কন্যা

২৯ চন্দ্রজ্যোতি
=শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়

৩০	ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়	কন্যা	কন্যা =নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। | দেবীবর মুখোপাধ্যায়	নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩০ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩১	মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় এটর্নী =দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজাদেবী	রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। =দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা উষাদেবী	যোগিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার =মেম	রজনী মোহন চট্টোপাধ্যায় এটর্নী =অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা ভগ্নী সুনয়নী দেবী	হেমলতা =দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্তান	সুশীলতা	সজনী মোহন চট্টোপাধ্যায় (বিকৃতমস্তিষ্ক)
৩২	৺মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৺নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়	৺তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার, বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য্য, সাহিত্যিক	৺রাণী	৺সুমনা	গীতা	দীপ্তি

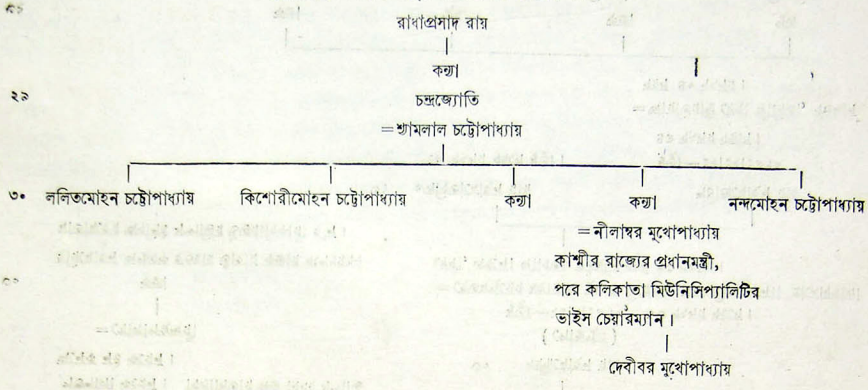

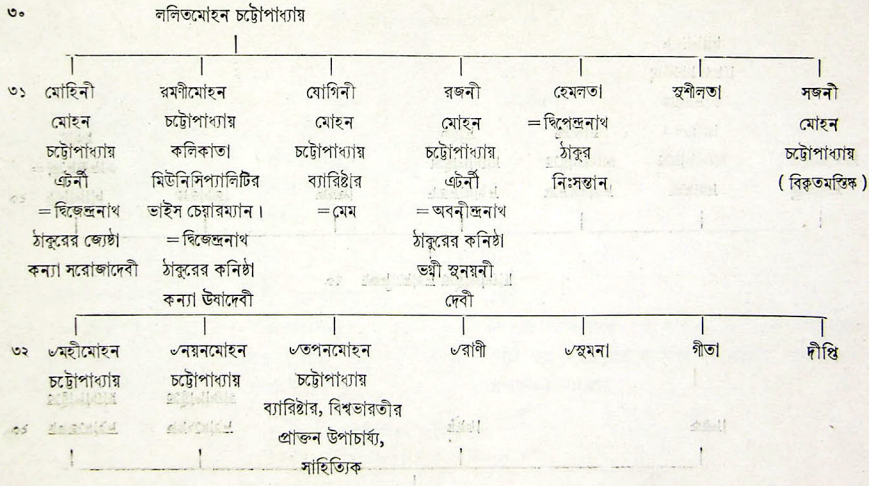

৩১ রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩২ রজতমোহন চট্টোপাধ্যায়	জগৎমোহন চট্টোপাধ্যায়	মুরলা	করুণা

৩১ রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩২ বীণাপাণি =দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রভাবতী	অম্বুজা	রতনমোহন চট্টোপাধ্যায় এটর্নি	মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার	স্বমোহন চট্টোপাধ্যায় =৺রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের কন্যা বীণাপাণি	শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩০ কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩১ নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	তরুলতা =ঋষিবর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধান জজ	সরলতা	মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

তরুলতা =ঋষিবর মুখোপাধ্যায়

৩২ ৺সতীশ মুখোপাধ্যায় =৺রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ভগ্নী সরলাবালা দেবী	৺যতীশ মুখোপাধ্যায় =৺রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ভগ্নী রণরঙ্গিণী দেবী	৺রাণী— =ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ('সাহিত্য' মাসিক পত্রের সম্পাদক) নিঃসন্তান।

৩১ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩২ ৺যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	৺অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩২ ৺যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট
মৃত্যু - ১৯৩৮
= ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কনিষ্ঠা কন্যা মতিমালী
মৃত্যু—১৯৩৯

৺অবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
নিঃসন্তান

৩৩ ৺ক্ষিতীশপ্রসাদ
চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা কর্পোরেশনের
ভূতপূর্ব এডুকেশন অফিসার,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
নৃতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব
প্রধান অধ্যাপক
জন্ম— ১৬।১২।১৮৯৮
মৃত্যু— ৩১।৫।১৯৬৩

৩৩ = ৺সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
জ্যেষ্ঠা কন্যা
মঞ্জুশ্রী দেবী
জন্ম- মার্চ ১৯০৭

৩৪ গৌতম চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক
= (১) ৺জয়া দেবী
(২) মঞ্জু দেবী

গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক
= আরতি দেবী

সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা একেলা ?

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

ব্যক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করে, না, ইতিহাস ব্যক্তি সৃষ্টি করে ? ইতিহাসের ভিতর থেকে কবিতার উদ্ভব হয়, অথবা কবিতা ব্যক্তিমনের নির্জন সৃষ্টি ?

প্রশ্নটি এখনও তর্কের বিষয়। জড় থেকে চেতনার উদ্ভব-প্রক্রিয়া যতদিন না পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে তর্কাতীতভাবে লক্ষ্য করা যাবে, ততদিনই প্রশ্নটি থেকে যাবে। ততদিন পর্যন্ত আমাদের অনুমানের উপর ভিত্তি করে জল্পনাকল্পনা করেই কাটাতে হবে সম্ভবতঃ।

একেবারে শেষ বয়সে, ৫ জুলাই ১৯৪১, রবীন্দ্রনাথ রানী চন্দকে বলেছিলেন, "বসে থাকুম—দূরের পাখি, চিল ডেকে যেত আকাশের গায়ে। দূর বহুদূর। আর বহুদূরের মাঠ—তারা যেন আরব্য উপন্যাসের খেলনা বিক্রি করে। আচ্ছা, এ রকম কেন হয়। তারপরে যখন কাছের লোকের দিকে চেয়ে দেখি—খটখটে ; মনে হয় আর-এক লোকেতে এসে পড়লুম। খুব শুকনো লাগে, মনে হয় এদের কণ্ঠে সেই দূরত্ব নেই। আমি এটা ভালো করে বলতে পারি নি, লিখতে পারি নি। আমি বাস করি দূরের মধ্যে। কাছাকাছি নিকটে আমি নেই। আমি যে সেই দূরের অন্তরে—সুদূরের অভ্যন্তরে আছি—তা ভালো করে বলা হয় নি। ঐ কথাই বলতে গিয়েছিলুম তাদের—যারা বলে যে একটা ইতিহাসের ভিতর থেকে কবিতার উদ্ভব। এই যে নতুন কিছু সামাজিক পরিবর্তন হল, এই থেকেই—কিছুতেই মন তা মানে না। আমার কবিতা কী থেকে হল। একটা উৎস থেকে হয়েছে—বহুদূরের স্রোত থেকে ; ইতিহাস থেকে নয়। এইজন্য কথায় কথায় আমি দূরের বাণীকে প্রকাশ করেছি। এই কবির এই কবিত্ব—এইখানেই তার মূল কথা। কোনো ইতিহাস তাকে বানায় নি—সকল ইতিহাসের মূলে সেই সৃষ্টিকর্তা বসে আছেন। কবি একলা, তাই হওয়া উচিত।"

এর দু'দিন পর রবীন্দ্রনাথ একই কথা বললেন রানী চন্দকে, ৭ই জুলাই।

"মূলকথা হচ্ছে যে সাহিত্য সাময়িক হতে পারে না। এখান কথা উঠেছে যে, কোনো একটা ইতিহাস থেকে সাহিত্য এসেছে। তা হতে পারে না। সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা একেলা—সে ভিতর থেকে প্রকাশ করে।—

"একদিন দেখলুম পোপার গাধাকে লেহন করছে গাভী মাতৃস্নেহে। এত আনন্দ হল—বলতে পারি নে। আমার বয়সের কোনো ছেলের তা হত না। এ তো সাময়িক নয়—আপনার ভিতর থেকে এ এসেছে। এর থেকে কবিতার অঙ্কুর বেরিয়েছে, ফলিত হয়েছে। তখন নানারকমের ঘোরতর ব্যাপার চলেছে—মিউটিনীর পর সামাজিক পরিবর্তনের যুগে। এগুলোর একটা বিশেষত্ব আছে। ছেলেবেলা থেকে আমি একরকম করে ভেবেছিলুম, দেখেছিলুম। তাদের দেখি বিচিত্রভাবে। সেইখানে রবীন্দ্রনাথ একলা তাঁর আসন নিয়েছিলেন ; জগৎ-সংসারকে তাঁর নিজের মনোবৃত্তি নিয়ে দেখেছিলেন। তখন ইতিহাস কী বলেছিল। সৃষ্টিকর্তা একেলা—সে চারিদিকের ঘটনা দ্বারা আবৃত। তারই মন নিয়ে সে ভেবেছে, বের করেছে এক-একটা রূপ।"

'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'-এ রানী চন্দ রবীন্দ্রনাথের যে মত প্রকাশ করেছেন তা একেবারেই হঠাৎ যে নয় তার প্রমান ১৩৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের উদ্বোধন অভিভাষণ, 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ', প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একই অভিমত প্রকাশ :

"অথচ সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। রাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সামাজিক বা ধর্ম সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে দল বাঁধা আবশ্যক হয়। কিন্তু, সাহিত্যসাধনা যার, যোগীর মতো তপস্বীর মতো সে একা। অনেক সময়ে তার কাজ দশের মতের বিরুদ্ধে। মধুসূদন বলেছিলেন, 'বিরচিব মধুচক্র'। সেই কবির মধুচক্র একলা মধুকরের।"

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি থেকেই অবশ্য অন্ততঃ হাজারটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেখানে রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যোগ প্রত্যক্ষ। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ ছাড়া 'চার অধ্যায়' সৃষ্টি হত না, প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ সম্পর্কে তৎকালীন বাদপ্রতিবাদ ছাড়া 'গোরা' রচিত হতে পারত না। উপন্যাস বাদ দিয়ে কবিতা বা নিছক গানের ক্ষেত্রেও অজস্র উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে যেখানে সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে গেছেন। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। অ্যাণ্ড্রুজকে তিনি ৭ জানুয়ারি ১৯২১ চিঠি লিখছেন, তাঁর 'স্বদেশী সমাজ'-এর মর্ম যখন দেশবাসী গ্রহণ করল না তখন তিনি লিখেছিলেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে / তবে একলা চল রে।'

এই আপাত অসংগতির ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন ১৩৩৪ সালের ৪ চৈত্র

বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে এক আলোচনাসভায়। 'সাহিত্যরূপ' বক্তৃতায় তিনি যা বলেন, তার সারমর্ম হল: বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে; বিষয়গুলি অনিবার্য কারণে আপনিই কালোচিত হয়ে ওঠে কিন্তু রূপের সৃষ্টি শিল্পীর নিজস্ব। রূপ ও বিষয়ের এই বিশ্লেষ কতটা সত্য, তার বিচার এখনও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় নি।

সাহিত্য কবির একেলার সৃষ্টি কি না, এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে চিরকালই ভাবিয়েছে। প্রথম দিকে তিনি এর অন্য এক সমাধান দিয়েছিলেন। ১৩১০ সালের ৫ পৌষ, দীনেশচন্দ্র সেন-এর 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।

"একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে, তাহা আর-কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া ওঠে।

"এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল, তেমনি আর এক শ্রেণীর কবি আছে যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

"এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের, সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন—ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না।"

এই মতপ্রকাশের বছর পাঁচেক আগে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় 'গ্রাম্য সাহিত্য' রচনায় লিখেছিলেন,

"গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না থাক্, সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে।—কল্পনার সংকীর্ণতা-দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।...

"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের

দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন-অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণ-রূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য, যেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাক্‌টার উপর দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুলফল-ডালপালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলির তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।"

এই প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে তিনটি বিষয়ের আলোচনা করতে চাই, যা থেকে প্রত্যক্ষ হবে, একই সময়ে রচিত অন্য সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। একটি বিষয়, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত। দ্বিতীয় বিষয়, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা, 'অপরপক্ষ'। তৃতীয় বিষয়, রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস, চোখের বালি। এই সাদৃশ্য এমনই প্রবল যে অনেকের মনে হতে পারে, একটি রচনা অন্যকৃত রচনার অনুকৃতি। কিন্তু একজন যে অন্যজনকে টুকেছেন, এটা তথ্যগতভাবে প্রমাণ কেউ করতে পারেন নি। এই প্রমাণ অভাবে, আমরা মানতে বাধ্য, যে ইতিহাসও সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং সাহিত্য শিল্পীর একেলা সৃষ্টি নয়। দেশে যখন কোন আন্দোলন উপস্থিত হয়, তা বঙ্গভঙ্গ যুগের স্বদেশী আন্দোলনের মতো প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক হতে পারে, আবার শিল্পবিপ্লবের মতো পরোক্ষ হতে পারে কিংবা বুর্জোয়া বিপ্লবের মতো সূক্ষ্ম হতে পারে, তখন তার প্রভাবে শিল্পীমন একইভাবে আন্দোলিত হয়।

* * * *

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে স্বদেশী সংগীতের জোয়ার এসেছিল। সুমিত সরকার তাঁর The Swadeshi Movement in Bengal গ্রন্থে এই স্বদেশী সংগীতের সংগ্রহ গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়েছেন। ১৯০৫ সালেই প্রকাশিত হয়: স্বদেশী পল্লীসঙ্গীত (রজনীকান্ত পণ্ডিত সংকলিত, ময়মনসিংহ), স্বদেশ সঙ্গীত (যোগেন্দ্রনাথ শর্মা, ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, নভেম্বর), যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত বন্দে মাতরম (দুই খণ্ড), জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সংকলিত দেশের গান। এর পর প্রকাশিত হয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সংকলিত স্বদেশ গাথা (১৯০৬), হেমচন্দ্র সেন সংকলিত মাতৃগাথা (১৯০৭), হীরালাল

সেনগুপ্ত সংকলিত হুঙ্কার (১৯০৮), নলিনীরঞ্জন সরকার সংকলিত বন্দনা (১৯০৮)।

স্বদেশী গান কীরকম জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ মিলবে, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বন্দে মাতরম্ সংকলনের এক বছরে তিনটি সংস্করণ প্রকাশ থেকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের উদ্যোগে সমস্ত স্বদেশী সভার উদ্বোধন ও সমাপ্তি হতো স্বদেশী সংগীত দিয়ে। স্বদেশী গান গেয়ে রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তোলার প্রথা শুরু করেন ১৯০৫-এর আগস্টে রমাকান্ত রায়।

বরিশালে মুকুন্দ দাস, ময়মনসিংহে সুহৃদ্ সমিতি, বাঁকুড়ায় ভাদু গায়কেরা, পাবনায় বৈরাগী ও বৈষ্ণবেরা স্বদেশী গান জনপ্রিয় করে তোলেন।

এই স্বদেশীভাব মূর্ত হয়ে ওঠে নাটকেও। গিরিশচন্দ্রের সিরাজুদ্দৌলা (১৯০৫) মীর কাশিম (১৯০৬), ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭); দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতাপ-সিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবারপতন (১৯০৮); ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিত্য (১৯০৬), পদ্মিনী (১৯০৬), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭), নন্দকুমার (১৯০৮), স্বদেশী আন্দোলনের ফসল।

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলা দেশের ইতিহাস গ্রন্থে একটি হিসেব দিয়েছেন, ১৯০৩ ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ অক্টোবর পর্যন্ত ৩০০০টি সভা হয় প্রকাশ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ করার দাবিতে। এই সব সভায় ৫০০ থেকে ৫০,০০০ শ্রোতা থাকতেন। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী ৫০০ প্রতিবাদ সভা হয় এবং ৭৫০০০ স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র পাঠান হয়।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেন নি, তার কারণ বয়কট নেতিমূলক আন্দোলন। ১৩২৮ আষাঢ়ের প্রবাসীতে প্রকাশিত একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, "(স্বদেশী আন্দোলনের সময়) তখন বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল বয়কট্ করে ইংরেজের লোকসান করা—আমিই একমাত্র তার প্রতিবাদ করেচি, বলেচি নিজের চেষ্টায় দেশের মধ্যে আত্মকর্তৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।" ওই পত্রে রবীন্দ্রনাথ দাবি করেছেন, তাঁর বঙ্গভঙ্গকালে রচিত প্রবন্ধগুলো পড়লেই তাঁর বয়কট-বিরোধিতা জানা যাবে। কথাটি সত্য নয়। ১৩১২ সালের ৯ ভাদ্র টাউনহলে তিনি পড়েন 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'। তাঁর 'ব্রতচারণ' রচনাটি পঠিত হয় কোনো স্ত্রীসমাজে ভাদ্র ১৩১২তে। এই দুটো প্রবন্ধেই তিনি বয়কটকে সমর্থন করেছেন। গানেও তিনি বলেছেন,

আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা তোর
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি। (১৯০৫)

'নব বৎসরে করিলাম পণ' কবিতায় লিখছেন,

পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজি পরের অশন
যদি হই দীন না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা। (১৯০২)

১৯০৫ সালের ১৩ই জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বয়কটের ডাক দেন। এই ডাক গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৫-এ প্রকাশিত 'বন্দে মাতরম্' গানের সংকলনে দেখা যায় সব গীত রচয়িতাই রবীন্দ্রনাথের মতো বয়কটের গান রচনা করেছেন। গিরিজাকুমার বসু লিখেছেন,

পদতলে দলি বিদেশী বিলাস
তব ব্রত যেন সাধি মা।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

যাব না আর যাব না ভিক্ষা নিতে পরের দোরে
আছে যা অশন বসন, তাই খাব তাই থাকব পোরে।

রজনীকান্ত সেন লিখেছেন,

পরের জিনিস কিনবো না
যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

রজনীকান্ত লিখেছিলেন,

মায়ের ঘরে মোটা কাপড়
পরলে কেমন সাজে

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ কবিতায়,

মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে!

আমরা এ কথাও জানি, রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮-এর পর দেশকে মা বলে ভাবতে বিরক্ত হতেন, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সময় ১৩১২ সালে অন্তত ৭টি গানে দেশকে মা বলে বন্দনা করেছেন। 'বন্দে মাতরম্' গীতগ্রন্থে লক্ষ্য করা যাবে অধিকাংশ কবিই দেশকে মা বলে ভাবছেন।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর সমকালীন একটি গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অয়ি ভুবনমোহিনীর (১৮৯৬ সালে রচিত) সাদৃশ্য স্পষ্ট:

নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী !
সুদূর নীলাম্বরপ্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে ;
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি ;
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী !
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত ছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙালিনী !

বস্তুতঃ, 'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থভুক্ত গানগুলির বহু পদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতের অনেক পদের মিল সহজেই চোখে পড়ে। এই মিলের ভিত্তি, একই চিত্রকল্প, একই ভাব, একই আবেদন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

কী শোভা কী ছায়া গো কী স্নেহ কী মায়া গো। (১৯০৫)
মরি হায় হায় রে !

আর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপোলে জলিল
মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে
কি বা জ্যোতি জলে উজল নয়নে
কি আনন্দে দিক্ পূরিল
ভারতজননী জাগিল

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

মিলেছি ভাই আমরা সবাই
মায়ের মুখের পানে চেয়ে
মায়ের সেবায় মিলেছি তাই
কোলাকুলি ভায়ে ভায়ে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ?

... ...

সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে। (১৮৮৭)

একজন অজ্ঞাত কবি লিখেছিলেন,

আপন মায়েরে চিনেছি এবার
লভেছি বিরাম স্থান জুড়াবার
'মা' বলে ডাকিতে, হৃদয়ের দ্বার
চকিতে গিয়েছে খুলিয়া।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক। (১৮৮৫)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন,

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে। (১৯০৫)

অশ্বিনীকুমার দত্ত লিখেছেন,

আয় রে ভাই সবে মিলি মাখি ভারতের ধূলি
এমন আর পবিত্র ধূলি নাহি ভূমণ্ডলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সোনার বাংলা গানে,

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে
তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি। (১৯০৫)

পঞ্চানন ঘোষ লিখেছেন,

এতদিন ছিনু ঘুমে অচেতন
জানি নি তোরে তুই মা কেমন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা। (১৯০৫)

করুণানিধান লিখেছেন,

চোখ ফেটে মা জল যে আসে
শুয়ে মা তোর নদীর ঘাসে
তোমার ওই সুনীল সুদূর ... ...
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

মা তোর বদনখানি মলিন হলে ওমা আমি নয়নজলে ভাসি। (১৯০৫)

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে। (১৮৯৩)

এর সঙ্গে তুলনীয়

মেল গো তোমার নিদ্রালস আঁখি
আর কতকাল রহিবে ঘুমে (পূর্ণচন্দ্র সেন)
অলস যারা ঘুমিয়েছিল পল্লীআড়ালে
তারাও আজি আপনা হতে বাহু বাড়ালে (করুণানিধান)
জাগ রে জাগ ভাই ভগ্নিগণ
আর থেকো না ঘুমে হয়ে অচেতন (অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

রবীন্দ্রনাথের 'ছি ছি চোখের জলে' গানের (১৯০৫) অথবা, 'মা কি তুই পরের দ্বারে' (১৯০৫) গানের ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে তুলনীয়

এতে মানুষ কদিন বাঁচে ?
ঘরের জিনিস লুঠ্‌য়ে দিয়ে, ভিক্ষা কর পরের কাছে ?
(চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ফিরে দ্বারে দ্বারে মাগিয়া মাগিয়া
পরের চরণ সতত চুমি (পূর্ণচন্দ্র সেন)
চিরদিন আছি ভিখারির মতো
জগতের পথপাশে—
যারা চলে যায় কৃপাচক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে
ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠো ওঠো সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে। (অজ্ঞাত কবি)

রবীন্দ্রনাথের শব্দচয়ন, চিত্রকল্পগঠন বা ধ্বনিসংগীতের সঙ্গে তদানীন্তন কবিদের গানের কোন তুলনা হয় না, এটা সত্য। এটাও সত্য হয়ত, অনেক কবিই

রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেছেন। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার, উপরের উদ্ধৃতিগুলো সবগুলোই নেওয়া হয়েছে 'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থ থেকে, যা প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। ১৯০৫ সালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেশির ভাগ স্বদেশী গান রচনা করেন। অন্যান্য কবির যে সমস্ত গান 'বন্দে মাতরম্'-এ আহৃত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই ১৯০৫ এর আগেকার লেখা। সুতরাং এই সব কবি যে রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করেছেন এই সন্দেহের যথেষ্ট যুক্তি নেই। উল্টে এ কথাও মনে রাখা যেতে পারে যে, যে-রবীন্দ্রনাথ পরে 'দেশমাতৃকা' এবং 'বয়কট' বিরোধী, সেই রবীন্দ্রনাথই এযুগে ঘোরতরভাবে দেশমাতৃকা এবং বয়কটের সমর্থক। অর্থাৎ, যে আন্দোলনে অন্যান্য কবিরা প্রভাবিত হচ্ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও সেই প্রভাবেই ভাবিত হচ্ছিলেন।

* * * *

রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'অপরপক্ষ' এবং বিষ্ণু দে-র কবিতা 'টপ্পা-ঠুংরি'—এই দুয়ের বিষয়ের মধ্যে আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার (রাবীন্দ্রিক-আধুনিক, চতুরঙ্গ, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩)।

'অপরপক্ষ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ বৈশাখের 'পরিচয়' পত্রিকায়, এর রচনাকাল জানা যায় নি। 'টপ্পা-ঠুংরি'র রচনাকাল ১৯৩৫ (১৩৪২), প্রকাশ ১৩৪৪ সালে। অতএব, অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথ 'অপরপক্ষ' রচনার আগে 'টপ্পা-ঠুংরি' পড়েন নি, বিষ্ণু দে-ও 'টপ্পা-ঠুংরি' রচনার সময় 'অপরপক্ষ' সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

দুটো কবিতাই পুরুষের উক্তি। নায়িকাকে আনতে নায়ক গিয়েছিল স্টেশনে, কিন্তু নায়িকাকে না-পেয়ে ফিরে আসে। এই দুটো কবিতার বিষয় এক হলেও, রচনার ধরন ভিন্ন, এটা লক্ষ্য করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার। তাঁর মত :

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির অগ্রগতি সরল পথে, বিষ্ণু দের তির্যক্ পথে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় একের পর এক ঘটনা সময়ের পরম্পরায় নিশ্চিতভাবে ঘটে যায়, বিষ্ণু দের কবিতায় দেখা দেয় প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যোগসাজসে নানা উল্লেখ, নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ, নানা দেশি-বিদেশি কবিতার প্রতিধ্বনি। দুটো কবিতাতেই কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান প্রসঙ্গ হলো সময়, যদিও রবীন্দ্রনাথে সময় ধারাবাহিক, বিষ্ণু দে-তে ব্যাহত, বক্রাকার। রবীন্দ্রনাথে আছে স্থিতিশীলতায় আস্থা, আস্তিক্যবোধ ; বিষ্ণু দে-তে আছে বিপর্যয়বোধ। রবীন্দ্রনাথের ছন্দেও, গদ্যছন্দ হলেও, ন্যায়ের পারম্পর্য কোথায়ও লঙ্ঘিত হয় নি। বিষ্ণু দে-র ছন্দ স্তবকে স্তবকে ভিন্ন স্পন্দনে, হার্মনিতে বিধৃত।

কবিতা দুটির এইভাবে বিশ্লেষণ করে, অশ্রুকুমার সিকদার সংশয় প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ কি বিষ্ণু দে-র কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পড়ে, জটিলতাময় অসরল আধুনিক কবিতা কীভাবে সরল অনাধুনিক ধরনে লেখা যায় তার আভাস দিয়েছেন?

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'টপ্পা-ঠুংরি' পড়ে 'অপরপক্ষ' লিখেছেন, এটার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই সন্দেহ অমূলক। বরং এটা অনুমান করা অনেক সহজ, সমকালে সমদেশে দুই কবির চেতনা একই অনুষঙ্গ থেকে আসছে। রবীন্দ্রনাথের 'অপরপক্ষ' রবীন্দ্রনাথের আস্তিক্যবোধের, স্থিতিশীলতার পরিচয়—এই ধারণাও অমূলক। সময়ের বিপর্যয়, সময় এবং সংসারের উপর কর্তৃত্ব হারানোর বোধ 'অপরপক্ষ' কবিতায় খুবই প্রবল। 'অপরপক্ষ' কবিতা হিসেবে সার্থক নয়, 'টপ্পা-ঠুংরি' সার্থক, এটাও অশ্রুকুমারের নিজস্ব রুচির প্রতিফলন।

* * * *

"যে বঙ্গদর্শনের বক্ষে একদিন বঙ্কিমবাবুর ও বাঙ্গালা ভাষার সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠতম নবেল 'বিষবৃক্ষ' ও 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই আজ রবিবাবুর 'চোখের বালি' বাহির হইতেছে। কর্তব্যানুরোধে এ বালি ঘাঁটিবার কর্মভোগ যখন আমাদের করিতে হইয়াছে, তখন তাহার উপযুক্ত আলোচনা অবশ্যই হইবে। কিন্তু আজ নয়, কয়েক দিন পরে। আপাততঃ মোটের উপর এই বক্তব্য যে, রবিবাবুর নির্ভীক স্বরে যে ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ ও সর্বপ্রকার সাহিত্যনীতির শৈথিল্য তাঁহার ও তদীয় বঙ্গদর্শনের পক্ষে 'অমার্জনীয়' প্রচার করিয়া তাহাদের সংস্পর্শবিরহিত হইতে প্রথমেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, সেই ভীরুতা, সেই রুচিভ্রংশতা, সেই সত্যের অপলাপ এবং সেই সর্বপ্রকার সাহিত্য-নীতির শৈথিল্য ষড়যন্ত্রে একজোট হইয়া তাহার এই কুৎসিত আখ্যানের আরম্ভ হইতে উপস্থিত অধ্যায় পর্যন্ত পূর্ণগ্রাস করিয়াছে। ইহার প্লট এবং নায়িকার নাম ও চরিত্রটি অপরের লিখিত ও অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত এবং রবিবাবুর বঙ্গদর্শনের এই প্রথম সংখ্যাতেই সমালোচিত একটি নবেলেরও নয়—'টেলে'র প্লট ও নায়ক নায়িকা চরিত্রের অবিকল অনুকৃতি; সর্বত্রই একই আত্মায় উভয়ের একই রূপ গতি এবং স্থানে স্থানে, এমন কি, একই শরীরে স্থিতি। সরলভাবেই বলিতেছি, রবিবাবু অজ্ঞাতে এই গলিত-পঙ্কময় প্রমাদে পড়িয়া থাকিবেন, নিশ্চয়ই অজ্ঞাতে তিনি ইহা করিয়াছেন, নহিলে জানিয়া শুনিয়া এমনতর কাজে কেহই প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এ ব্যাপারটা কেবল বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের নয়, সমগ্র

সাহিত্য সংসারের একটা অতি বিস্ময়কর ও রহস্যময় সুসদৃশ ঘটনা। 'চোখের বালি' সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিলাম, তাহা উহার আলোচনাকালে আমরা অক্ষরে অক্ষরেই দেখাইয়া দিব, এবং তৎকালে উক্ত বিস্ময়কর রহস্যের আমরা মীমাংসা করিয়াছি, তাহাও সবিস্তারে বলিব। তখনই তিনি সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা তাহার সরল ও বেদনাহীন কঠিন সমালোচক হইলেও, তাহার শত্রু ও নিন্দুক নহি।···

"'চোখের বালি' যে বইখানির অবিকল অনুকৃতিবৎ, তাহার নাতিহ্রস্ব ও কিঞ্চিদতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, স্বয়ং মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর নব বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই করিয়াছেন। অপ্রিয় সত্যোৎঘাটনে ও বিকৃতি বিশ্লেষণে ন্যায়তঃ বাধ্য বিচারক ও সমালোচকের অনুপযুক্ত অতিরিক্ত সদয় দৃষ্টিতে দেখিয়াও দোষজ্ঞাপন অপেক্ষা গুণকীর্তনে অধিকতর অভিলাষী মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনতিক্রমনীয় কর্তব্যের অনুরোধে, যেন একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হইয়াই বলিতেছেন—'···ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডচিত্র অঙ্কিত করিতে পারা এক; ক্ষুদ্র চিত্রগুলিকে অন্তর্গত করিয়া একটা বিশাল চিত্রপট আঁকা আর। পাঁচকড়িবাবু প্রথমোক্ত রকমে কৃতকার্য; দ্বিতীয়োক্ত রকমে ব্যর্থ প্রয়াস!···এই উপন্যাসের মুখ্য চিত্র উমাকেই দেখ। উমা একটি আস্ত জীবন্ত মানুষ হয় নাই···একটি রক্তমাংসের বেদান্তদর্শন হইয়াছে মাত্র।···পাঁচকড়ি-বাবু স্বর্গের চিত্রই আঁকিতে গিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, তাহা নরকের চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে পাপচিত্র পাঁচকড়িবাবু আঁকিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা।'

নূতন লেখক পাঁচকড়িবাবুর সম্বন্ধেই যখন ইহা অতি সদয় ও মৃদু মন্তব্য, উচ্চতর স্তরের অভ্যস্ত ও পুরাতন লেখক রবীন্দ্রনাথবাবুর বই 'বালি' সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি বুঝিয়াছেন ও বলিতে চাহেন, জানিতে চাওয়া অন্যায় নহে।

"রবিবাবুর এই বই অতঃপর "বঙ্গদর্শনে" বাহির হওয়া বন্ধ হইলেই, বোধ হয়, ভাল হয়। কারণ, তাঁহার এই চোখের বালি বঙ্কিমবাবুর হউক, তাঁহার হউক বা আর যাহারই হউক, বঙ্গদর্শনের মুখে চূণকালী মাখিয়া দিতেছে। তাহা একবারের জন্য হইলেও হইত মাসে মাসে পূর্বনামজাদা 'মান্যমান' লোকের মুখময় চূণকালী মাখানটা ভাল দেখায় কি?"

নব বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হলে ১৩০৮ ফাল্গুন মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই মন্তব্য করেন। 'চোখের বালি' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়

১৩০৮ বৈশাখ থেকে ১৩০৯ কার্তিক পর্যন্ত। অর্থাৎ 'চোখের বালি'র অর্ধেক অংশ প্রকাশিত হওয়ার পর সুরেশচন্দ্র এই মন্তব্য করেন। 'চোখের বালি' যখন প্রথম প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন সুরেশচন্দ্র 'চোখের বালি' 'উমা'র নকল বলে ভাবেন নি। ১৩০৮ আষাঢ়ের 'সাহিত্য'-এ তিনি লিখছেন

"রবীন্দ্রবাবুর 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি' অনেকটা এক খাতে চলিতেছে! উভয়ের স্বাতন্ত্র্য বড় সূক্ষ্ম। যাক্ সমাপ্তির পূর্বে বিসর্জনের বাজনা বাজাইবার কাহারও অধিকার নাই।"

সুরেশচন্দ্র কিন্তু তাঁর অঙ্গীকার টিঁকিয়ে রাখতে পারেন নি, 'চোখের বালি' বেরুবার মাঝপথেই মন্তব্য করে বসেছেন, অথচ শেষ হলে এ-বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র পাঠক এবিষয়ে একটি অনুমান করতে পারেন। 'চোখের বালি'তে বিনোদিনীর প্রবেশ ঘটে গল্প আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছু পরে, সপ্তম অধ্যায়ে। অর্থাৎ আষাঢ়ের সাহিত্য-এ লেখার সময় 'উমা' ও 'চোখের বালি'র সাদৃশ্য গোচর হয় নি। আবার 'চোখের বালি' মাঝপথ থেকে 'উমা'র মাঝপথ থেকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে দুটো উপন্যাসের সাদৃশ্য ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়েছে। হয়ত সেজন্যেই সুরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

ফাল্গুনের 'সাহিত্য'-এ সুরেশচন্দ্রের মন্তব্য যে অমূলক নয়, সেটা 'উমা'র পাঠকেরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। 'উমা' যেহেতু সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং এখানে 'উমা'র একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। পাঁচকড়ি 'উমা' লেখার সময় 'চোখের বালি'র কথা জানতেন না, কেননা 'উমা'র সমালোচনা বেরিয়ে যাবার পর বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি' প্রকাশ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ 'উমা' পড়েছিলেন কিনা জানা যাচ্ছে না। তিনি 'চোখের বালি'র খসড়া শুরু করেন ১৮৯৯ জুলাইয়ের (১৩০৬ শ্রাবণ) আগে, ১৯০১ ফেব্রুয়ারিতে নাটোরের মহারাজকে বিনোদিনীর গল্পাংশ শোনাচ্ছেন এবং লিখে ফেলার প্রেরণা পাচ্ছেন, মার্চ মাসে লিখতে শুরু করছেন, এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে।

'উমা' উপন্যাসের মুখ্য পুরুষ চরিত্র যোগেশ্বর সুপুরুষ, সুপণ্ডিত, ইংরেজিনবীশ এবং কালেক্টর। মুখ্য নারী চরিত্র উমা বড়ঘরের মেয়ে, বড় আদুরে, বড়ই মুখচাওয়া। যোগেশ্বর উমাকে বিবাহ করে মুঙ্গেরে গেল। সেখানে উমা ও তার শিশুপুত্রের গানগল্প দিয়ে উপন্যাসের সূত্রপাত।

সুখের সংসারে যোগেশ্বরের মাতাও আছেন, যাঁর কাছে উমা, যোগেশ্বর এবং তাদের শিশুপুত্রের আদর এবং আবদারের সীমা নেই। উমা আবার সন্তানসম্ভবা, তাই তার প্রস্তাব, উমার মামাতো দিদি বিনোদিনী এসে সংসারে সাহায্য করুক। বিনোদ বালবিধবা, তবে মেয়ে ভালো, গতর আছে, হিসেবও আছে আর চোপা নেই, অতএব যোগেশ্বরের মাতার অসম্মতি নেই। কিন্তু যোগেশ্বরের আপত্তি, বিনোদ পূর্ণ যুবতী, সুন্দরী, সুশীলা ও চতুরা, বিনোদের আবির্ভাবে উমার ফুটো কলসীর তলা চুইয়ে যদি জল ওঠে, কলসী যদি অগাধ জলে ডুবে যায়, এই আশঙ্কায়। উমা এই আশঙ্কায় চমকে উঠল, কিন্তু তার জিদের জন্যে বিনোদ তাদের সংসারে এল।

বিনোদ পাকা গৃহিণী, যোগেশ্বরের মায়ের বিশ্বাসের পাত্রী, কিন্তু সে যোগেশ্বরের সামনে বেরোয় না। উমা তাকে জোর করে যোগেশ্বরের সামনে আসতে বাধ্য করল। এতদিন বিনোদিনী লুকিয়ে লুকিয়ে যোগেশ্বরের সেবা করে তার কুতূহলের মূলে জল সেচন করছিল।

"যাহা পাওয়া যায় না, তাহাই সুন্দর; যাহা নিজের নহে, তাহাও সুন্দর। যোগেশ্বর, বিনোদিনীকে দেখিতে পায় না বলিয়াই, সুন্দর দেখিয়াছিল; বিনোদিনী তাহার নহে বুঝিয়াই যখন দেখিত, তখনই তাহাকে সুন্দর দেখিত। যোগেশ্বরের পার্শ্বে যে রমণীরত্ন বসিয়া থাকিতেন, তিনি ত সাক্ষাৎ দেবীমূর্তি—সৌন্দর্যের প্রতিমা। কিন্তু তিনি যে যোগেশ্বরের নিজস্ব, তিনি যে যোগেশ্বরের অনায়াস-লব্ধ! কাজেই যোগেশ্বরের দৃষ্টিতে তিনি, এখন আর তেমন সুন্দরী নহেন! সুন্দরী কেবল বিনোদিনী।

"যোগেশ্বরের ভালবাসায় একনিষ্ঠা ছিল না, তাই যোগেশ্বর নিজের সামগ্রীর আদর করতে জানিত না। উমা কখনও দর-দস্তুর করে নাই, উমা বিনামূল্যে বিকাইয়াছিল। তাই উমা রূপের ভাণ্ডার হইয়াও, দিবা দ্বিপ্রহরেই যৌবনের ভরা হাটের মধ্যে দোকান বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। উমা আবার নিজের হাতে বিনোদিনীর দোকান খুলিয়া দিল। নিজে ডাকিয়া আনিয়া খরিদ্দার জুটাইয়া দিল।"

"বিনোদিনী ধর্মাধর্ম জানিত না, পাপপুণ্যও বুঝিত না। এতদিন সে কেবল বৃহৎ সংসারে দশজনের দশ জোড়া চক্ষের উপর অহরহ বিচরণ করিত। মনে মনে বিলাসবাসনা থাকিলেও লজ্জাভয়ে এবং নিন্দাভয়ে স্থির ছিল।···বিনোদিনী যখন যোগেশ্বরের মনের দৌর্বল্য বুঝিল, তখন তাহার লজ্জার আবরণ একেবারে খসিয়া

পড়িল, আর চিরদিনের পিপাসিত প্রবৃত্তি করাল ব্যালের মত গর্জিয়া শত ফণা বিস্তার করিয়া, হৃৎকোটর হইতে বাহির হইল।"

উমা-বিনোদিনী-যোগেশ্বরের এই উন্মাদ আচরণে যোগেশ্বরের মতো নবদুর্গাও নিজের অজ্ঞাতে ঘৃত এবং অগ্নির বিষম সংযোগ হতে দিলেন। "বিশেষতঃ, দুর্গা ঠাকুরাণীর এই কথাটি জানা উচিত ছিল যে, তিনি চিরকাল যোগেশ্বরের সংসারে পর্বতের আড়াল হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার জরা উপস্থিত হইবে, দেহ চূর্ণ হইবে, তাঁহাকে যাইতে হইবে। তখন ত একলা যোগেশ্বরকে সংসারের সকল ভার লইতে হইবে। তখন উমাকে গৃহিণীপনা করিতে হইবে।"

সূতিকাগৃহ থেকে বেরিয়ে উমা লক্ষ্য করল বিনোদিনী-যোগেশ্বরের প্রণয়লীলা। দ্বিরুক্তি না করে সে পিত্রালয়ে চলে গেল স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। ছয়মাস পর সে যখন ফিরে এল, দেখল তার সোনার সংসার পুড়েছে। যোগেশ্বরের দ্বিতীয় দিকে খেয়াল নেই, বিনোদিনীও সংসার দেখে না। উমার প্রথম পুত্র অবহেলিত, দুর্গাঠাকরুণ মনের দুঃখে কাশীবাসী হয়েছেন। উমা যখন ফিরে এল তখন বিনোদিনীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। উমার প্রত্যাবর্তনে এবং ক্ষমাশীলতায় যোগেশ্বরের চৈতন্য হল। বিনোদিনীর গর্ভনাশের চেষ্টা হল এবং সেই চেষ্টায় তার প্রাণবিয়োগ ঘটল। অতঃপর উমা-যোগেশ্বর কাশী গেল নবদুর্গাকে ফিরিয়ে আনতে। নবদুর্গা ফিরতে পারলেন না। আগেই অসুস্থ ছিলেন, পুত্র এবং পুত্রবধূকে ফিরে পেয়ে শান্তিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কাশীতে দেখা হল যোগেশ্বরের সন্ন্যাসী বাবার সঙ্গে। বাবা ছেলেকে বললেন দুটো কথা। "তোমরা পাপী দৌর্বল্যহেতু, প্রকৃতিগত দুষ্টতার জন্য নহে।" "পাপের প্রায়শ্চিত্ত পুণ্যকর্ম—অনুতাপে নহে।"

মাতৃশ্রাদ্ধের পর উমা যোগেশ্বরকে নিয়ে ফিরে এল সংসারে। "যাও মা—সংসারক্ষেত্রে আবার যাও। দেশ পবিত্র হউক, কুল পবিত্র হউক, জননী কৃতার্থা হউন।"

'উমা' উপন্যাসের মূল চারটি চরিত্রের আচরণের ব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক স্বয়ং দিয়ে গেছেন।

বিনোদিনী মৃতস্বামীর স্মৃতিসুখেও বঞ্চিত ছিল। তার কবে বিবাহ ঘটেছিল, কবে বিধবা হয়েছিল, কিছুই তার স্মরণে নেই। "সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়াই কি তাহার অপরাধ। তবে তাহার রূপ রহিল কেন, যৌবন রহিল কেন? প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী হইবার পক্ষে আত্মীয়স্বজন তাহার সহায়তা করিল না কেন?"

সনাতন হিন্দুধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী বিধবার প্রেমনিবেদন বা দেহদান গুরুতর অপরাধ, সেই অপরাধে বিনোদিনী অপরাধী। নবীন হিন্দুসমাজে বিধবার বিবাহ সমাজস্বীকৃত, অতএব বিনোদিনীর দেহদান খুব গুরুতর অপরাধ নয়, তবে অপরাধ বিবাহ ছাড়াই সে দেহদান করেছে। কিন্তু নবীন নীতিশাস্ত্রবিরোধী যে গুরুতর অপরাধ করেছে, তা হলো উমার সংসারে অশান্তির সৃষ্টি।

"তাজমহলের ক্রোড়ে প্রণয়-শোকের কঙ্কাল লুক্কায়িত আছে। বিনোদিনীর হৃদয়ে হয়-ত মনুষ্যত্বের চিতাভস্ম লুক্কায়িত আছে।

"বিনোদের ভরা-যৌবনও আছে—স্থির ধীর গম্ভীর যমুনা-প্রবাহের ন্যায় যৌবন টলটল করিতেছে।···হয় ত বা যমুনা-প্রবাহের মত সে যৌবন-প্রবাহে মকর-কচ্ছপও আছে।"

"এই সুখের সংসারের আনন্দচন্দ্রিকাপ্রভায় বিনোদিনীর শান্তশীতল দেহকান্তির উপর লালসার চঞ্চলদীপ্তি যেন ফুটিতেছে।"

"আমি আছি শীতল পর্বত। কিন্তু যখন হৃদ্‌গত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইবে। তখন উমার ন্যায় তৃণখণ্ড পুড়িবে।"

'চোরের বালি'র উপন্যাসটির সঙ্গে 'উমা'র সাদৃশ্য খুবই প্রত্যক্ষ। চারটি প্রধান চরিত্র উভয়েই বর্তমান। মাতা পুত্রস্নেহে অন্ধ কিন্তু পুত্রের চরিত্রবৈকল্যে মর্মাহত। স্ত্রী স্বামীগর্বে গর্বিত এবং স্বেচ্ছায় স্বামীকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দেয় বিধবা, সুন্দরী, সংসারকর্মে নিপুণ দূর-আত্মীয়া যুবতীর হাতে। স্বামীর চরিত্র-বৈকল্য ঘটে। সাংসারিক বিপর্যয়ের পর স্বামীর চৈতন্য হয়, অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে, স্ত্রীও গ্রহণ করে, মাতাও ক্ষমা করে। স্বামীকে উপদেশ দেওয়া হয়, অনুতাপে পাপের স্খলন হবে না, কর্মের মধ্য দিয়ে শুদ্ধিলাভ করতে হবে। স্বামী কর্মব্রতে যোগ দেয়। বিধবা যুবতী সংসারপট থেকে অন্তর্ধান করে।

'চোরের বালি' ও 'উমা'র প্লটের এই মূল কাঠামো এক। চরিত্রগত সাদৃশ্যও যথেষ্ট। উমার 'সঙ্গে আশার, দুই বিনোদিনীর, নবদুর্গার সঙ্গে এবং যোগেশ্বরের সঙ্গে মহেন্দ্রর। উমা ও আশা দুজনেই আদরে বর্ধিত; সংসারকর্মে অনিপুণ, স্বামীর আদরে আশ্বাবতী, ক্ষুদ্র সন্দেহ ঈর্ষার ঊর্ধ্বে। দুই বিনোদিনী প্রেম ও বিবাহসুখে বঞ্চিত এবং প্রথম সুযোগেই অতৃপ্ত কামনা নিরসনে উৎসুক। সুখী স্ত্রীর ছবি তাদের ঈর্ষিত করে তোলে বটে। কিন্তু তাদের শোচনীয় পরিণতির কারণ তারা একেবারেই স্থূল প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত নয় বলে। অপরের স্বামীকে দখল করার তাগিদের পিছনে আছে তাদের অস্তিত্বের, নারীর যৌন অধিকার প্রতিষ্ঠা করার

প্রয়াস। তারই সঙ্গে আছে অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করার জন্য আত্মধিক্কার। যোগেশ্বর এবং মহেন্দ্র দুজনেই অহংবোধপূর্ণ যুবক, সংসারের সব ভালো জিনিসের উপর অধিকার করায় তাদের প্রয়াস, কিন্তু তারই সঙ্গে আছে নিজেকে ক্ষুদ্র করার চেষ্টায় সামাজিক চোখে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করায় আত্মগ্লানি। এবং দুই মাতা—দুজনেই পুত্রস্নেহে অন্ধ, পুত্রকে যথেষ্ট শাসন করেন নি এবং প্রথম সাংসারিক ঝড়েই উড়ে গেছেন।

এই বিস্ময়কর সাদৃশ্যের কারণ এখনও রহস্যময়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্পর্ক মধুর ছিল না। রবীন্দ্রনাথ পাঁচকড়ির উপন্যাস পড়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। পড়লেও রবীন্দ্রনাথ সেই উপন্যাস কর্তৃক প্রভাবিত হবেন, মনে হয় না। পাঁচকড়ির গল্পের মূল বিষয় অবশ্য রবীন্দ্রনাথে অনেক পরিশীলিত অনেক বিশ্বাসজনক, অনেক জটিল রূপ ধারণ করেছে। এমনও হতে পারে, যেমন সুরেশচন্দ্র অভিযোগ করেছিলেন, পাঁচকড়ি এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই একটি বিলিতি উপন্যাসের ধাঁচটা নিয়েছিলেন। তবে কথাটি এই নয় যে, দুজনেই অন্য উপন্যাসের বা একে অপরের উপন্যাসের অনুকরণ করেছিলেন। কথাটি এই যে দুজনেই একই উৎস থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। এবং সেই উৎস, বুর্জোয়া সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে বাঙালি সমাজে বিধবা যুবতীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। বিধবার বিবাহে অধিকার নেই, এই ফিউডাল সংস্কার আগেই ভাঙতে শুরু করেছে। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় এবং সমাজের অন্যান্য শক্তির সমবেত আন্দোলনে বিধবা বিবাহ স্বীকৃত হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'তে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়েছেন। কিন্তু বিষবৃক্ষ কুন্দনন্দিনীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী নয়, 'উমা' এবং 'চোখের বালি' বিধবা রমণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের কাহিনী। এই দুটো উপন্যাসের সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে বিধবাসমস্যার জন্য নয়, এক রমণীর আচরণে সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে বলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তে বাঙালি পরিবারে সাংসারিক শান্তি বনাম আত্মসুখের দ্বন্দ্বে সাংসারিক শান্তি বজায় রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করা হতো।

কবিতাগুচ্ছ

অরুণ মিত্রের কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এক সময় আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় দুজনের কবিতার জন্যে আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা ক'রে থাকতাম। একজন অরুণ মিত্র, অন্য একজন—আজ কারো মনে থাকার কথা নয়—সত্যশান্তি ঘোষাল। সত্যশান্তি ঘোষাল বড় চাকরিতে আজ দীর্ঘদিন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। 'তির্যক' বইতে অংশত তাঁর কবিতা ছিল। তাঁর একার কোনো কবিতার বই বেরিয়েছিল কিনা জানি না। আমি যদি কোনদিন এ কালের বাংলা কবিতার সংকলন করি, তাহলে তাতে এমনি কিছু ভুলে-যাওয়াদের কবিতা ঠাঁই পাবে।

অরুণ মিত্র কখনো হারান নি। কিন্তু সম্পাদক আর প্রকাশকদের অমনোযোগে এবং সমালোচকদের দৃষ্টিকৃপণতায় বেশির ভাগ পাঠকই জানেন না তাঁরা কী হারিয়েছেন। পুরস্কারের কথা আমি তুলছি না। কেননা সাহিত্যে পুরস্কার বা খেতাবের চেয়ে ঢের দামী জিনিস মনের মতন পাঠকের মন পাওয়া।

অরুণ মিত্রের কবিতার বই খুব বেশি নয়। যে আনুকূল্যে পাঠকেরা না চাইতেই পায়, তাঁর কবিতা সে আনুকূল্য পায় নি। অরুণ মিত্রের কবিতার নাগাল তারাই শুধু পায় যারা চায় এবং যারা খোঁজে।

যে যাই বলুক, আধুনিক বাংলা কবিতা এখন জাতে উঠেছে। নোট বইয়ের লেখকদের এখন হিং টিং ছটেরও অর্থ বার করতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠা পেয়ে এবং ব্যাখ্যার গুণে সব এখন জলবত্তরল।

নির্বাচকদের কাছে অচ্ছুৎ বলেই অরুণ মিত্রের কবিতা বোধহয় পার পেয়ে গেছে। ইস্কুল কলেজে অ-পাঠ্য থাকায় নোট বইয়ের লেখকেরা তাঁকে ধরতে ছুঁতে পারে না এবং গুরুমশাইরা তাঁকে তুলো-ধোনা করতে পারে না।

কবিকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর কবিতার কাছে যাওয়াই ভালো।

'প্রান্তরেখা' থেকে 'উৎসের দিকে'। তারপর আবার 'ঘনিষ্ঠ তাপ' থেকে 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'।

পদ্যে শুরু। তারপর স্বচ্ছন্দে গদ্যে। 'প্রান্তরেখায়' শুধু একটিই ছিল পুরোপুরি গদ্যে। 'কশাকের গান : ১৯৪২' গদ্যেপদ্যে মেশানো।

'উৎসের দিকে'তে এসে বদল শুধু বোলচালের নয়। দৃষ্টিরও। চোখের সামনে থেকে নেপথ্যে। মঞ্চ ছেড়ে মাটিতে।

সদ্য পড়া শেষ ক'রে, তখন বলতে আজ থেকে বিশ বছর আগে, কী লিখেছিলাম বলছি—

চরৈবেতির মন্ত্র এখন কম শোনা যায়। জাতে উঠে আধুনিক বাংলা কবিতার পায়ে যেন শিকড় গজিয়েছে। সেই অশান্ত দুরন্তপনা আর নেই। এখন সাবধানে পা টিপে টিপে চলা, পান থেকে চুন না খসিয়ে নিখুঁত হওয়া, লোকের মন জুগিয়ে ভালো ছেলে সাজা। যে রকম সনাতন ধর্মে মতি দেখা যাচ্ছে, তাতে আধুনিকতার পাট ওঠার দাখিল।

কিন্তু এই গিলে-করা ধোপদুরস্ত ভাব কখনই কবিতার ভালো করতে পারে না। ক্রমে দোহারের দল আসর জাঁকিয়ে বসছে। কোনোরকম বে-আদবি না করে, কাউকে না ঘাঁটিয়ে, সবাইকে আপনি-আজ্ঞে করে বড়ো জোর রাজদরবারে খেতাব পাওয়া যায়—কবিতার বেড়া ভাঙা যায় না।

বিদ্রোহের পতাকা অরুণ মিত্রের হাতে এখনও উঁচু করে ধরা আছে। তাঁর হাতের আস্তিন গোটানো; প্রার্থনায় জোড় নয়। তাঁর গলায় এখনও চরৈবেতির মন্ত্র গমগম্ করে বাজছে।

অরুণ মিত্রের সমকক্ষ কবি বাংলায় খুব বেশি নেই। কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের সমান তাঁর খ্যাতি নয়। বাঁশবনে ডোমকানা সমালোচক এবং সংকলকদের আক্কেল যাই বলুক, খ্যাতি কখনই কবিত্বের মাপকাঠি নয়। মাপকাঠির এই গলদের জন্যেই বোধহয় অরুণ মিত্রকে এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে।

কিন্তু তার চেয়েও সহজ হয়েছে তাকে এড়িয়ে গিয়েও পার পাওয়া। তাতে কোনো মৌচাকে ঢিল তো পড়েইনি, কোনো গুঞ্জনও ওঠেনি।

কবিতায় যাঁরা শুধু মধুরতা খোঁজেন, অরুণ মিত্রের কবিতা বরাবরই তাঁদের হতাশ করেছে। হাতে মোয়া দিয়ে মন ভোলাবার গুণ তাঁর নেই। তাঁর কবিতার

রস অন্য জাতের। কখনও একটু তিতকুটে, কখনও বুক পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু মাতিয়ে তোলে। হাতপায়ের খিল খুলে দেয়।

অরুণ মিত্রের কবিতা কঠিন, কিন্তু কেঠো নয়। তার মধ্যে এমন একটা ছিলা পরানো টান-টান ভাব থাকে যা এলিয়ে পড়তে-চাওয়া আয়েশি পাঠকদের মন ভরাতে পারে না। ওপর-ওপর চোখ বুলিয়ে পড়লে সে কবিতা কোনো সাড়াই জাগায় না। চোখ-কান খাড়া রেখে পড়তে হয়। অরুণ মিত্রের কবিতা ঘুম কেড়ে নিতে পারে, ঘুম পাড়াতে পারে না।

এ কবিতার মেজাজই আলাদা। স্বভাবকবির মুখে খৈ-ফোটানোর সঙ্গে এর মিল নেই।

অরুণ মিত্র সময় নেন। হাতে-গরম বিষয়ের ওপর হাতে-গরম কবিতা তিনি বড়ো একটা লিখেছেন বলে মনে পড়ে না। এমনকি রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় যখন তাঁর আপাদমস্তক মোড়া ছিল তখনও নয়, বাংলার প্রথম নাম-লেখানো কমিউনিস্ট কবি হওয়া সত্ত্বেও নয়।

সর্বঘটে-থাকা নারদবৃত্তির যে বিপদ আছে, এটা তিনি জানতেন। সমসাময়িক ঘটনায় উদ্বুদ্ধ তাঁর পুরনো কবিতাগুলো আজও যে তেলচিটে ঠেকে না তার কারণ নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর বেছে নেবার তাঁর ক্ষমতা আছে। নিজেকে আড়ালে রেখে নয়, সমাজের দিকে বরাবর মুখ ফেরানো ছিল বলেই এ ক্ষমতা তাঁর মুঠোয় এসেছে।

যাঁরা হাত-পা ছোঁড়াকেই আবেগ জানানোর একমাত্র উপায় বলে মনে করেন, অনেক সময় কবিতার অনেক আবেগ তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। ইশারা করাকে তাঁরা মাথা খাটানো বলে ভুল করেন। সাঁটে বললে তাঁরা ভাবেন তার মধ্যে বুঝি যুক্তি আঁটা হল।

অরুণ মিত্রের কবিস্বভাবটাই একটু বেয়াড়া ধরনের বলে কেউ কেউ তাঁর কবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পান না। বলবার ধরনটা তাঁর কাটা-কাটা। এক নিশ্বাসে গড়গড় করে বলে যাওয়া নয়।

ছন্দকে যাঁরা সুরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন, তাঁদের বোঝা দরকার কবিতা কখনই আর গানের আদিম উৎসে ফিরে যাবে না। একই গতি, কিন্তু তার চাল অনেক। কাটা-কাটা হলেই চাল ব্যাহত হয় না।

তাই খুব কম লেখা সত্ত্বেও, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে লিখলেও, অরুণ মিত্রের কবিতায় ধারাবাহিকতা কখনও ছিন্ন হয় না। থেমে থাকার পর শুরু হলে যে ঝাঁকুনি লাগার কথা, সে ঝাঁকুনি তাঁর কবিতায় টের পাওয়া যায় না।

অনর্গল লিখে না গেলে হাত আড়ষ্ট হয়, একথা আর যার ক্ষেত্রেই খাটুক না কেন, অরুণ মিত্রের বেলায় খাটে না। বরং দীর্ঘ সময়ের ছেদ থাকা সত্ত্বেও অবিচ্ছিন্নতা দিয়ে তিনি এটাই প্রমাণ করেছেন—হাত কবিতা লেখে না, মনই লেখে।

যেমন, 'উৎসের দিকে'র প্রকাশকাল ডিসেম্বর, ১৯৫৫। ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ "বস্তুত ছুটো বই একসঙ্গে জোড়া হল।…সময়ের দিক থেকে 'স্মরণকাল' অংশ পূর্ববর্তী। এর রচনা ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে।

বইতে প্রথম ছ'বছরের কবিতার সংখ্যা কুড়িটি। শেষ সাত বছরের কবিতার সংখ্যা একুশটি। মোট হিসেব করলে দাঁড়ায়, গড়ে বছরে তিন-চারটির বেশি কবিতা তার হাত দিয়ে বেরোয়নি।

কিন্তু এই হিসেবও ঠিক নয়। মাঝে মাঝে নিশ্চয় দীর্ঘ সময়ের ছেদ আছে। সম্ভবত ১৯৪৮-এর পর এইরকমের একটা ছেদ পড়েছে। কেননা একমাত্র সময়ের সম্ভাব্য ছেদ ছাড়া ছুটি অংশের মধ্যে কোনো বড় রকমের ভাবান্তর চোখে পড়ে না। যে কারণেই হোক ছুটি বই যখন একসঙ্গে জুড়তেই হল, 'স্মরণকাল' দিয়েই বই শুরু হওয়া উচিত ছিল।

'উৎসের দিকে'র যে কবিতাগুলো আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো এবং এখনো লাগে তার মধ্যে 'সঞ্জীবন', 'সীমান্ত', 'ভ্রূকুটি', 'অপরিমাণে', 'একাগ্র দুঃখের তপে', 'ছয় ঋতু সঞ্চয় করি', 'এ জ্বালা কখন জুড়োবে', 'অমরতার কথা', 'কলকাতায়', 'তোমার নাম মিলিয়ে দিলাম', 'যেখানে উত্তাপ নেই'। ভালো কবিতার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে বাছতে গিয়ে খানিকটা দিশেহারা হতে হতো। এ কথা আজো জোর করেই বলা যায় 'সীমান্ত', 'ভ্রূকুটি', 'রাতের পর দিন', 'অমরতার কথা', 'ছয় ঋতু সঞ্চয় করি'র মত আধুনিক কবিতা খুব বেশি নেই।

অরুণ মিত্রের কবিতার বড় গুণ ফাঁকা কথার ওপর তাঁর আস্থা নেই। কথার ভেতর অনুভবগ্রাহ্য পৃথিবীটাকে এঁটে দিতে না পারলে তিনি সুখী নন।

তাই যখন পড়ি ঃ

'আমার বয়সের খাদে গুরু গুরু গড়ায় তারা ;
প্রতিমাগুলো বয়ে এনেছিলাম
মাথা ভ'রে কাঁধ ভ'রে এত উঁচুতে
তারা এখন ভাঙল, (সীমান্ত)

কিংবা

'আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি জ্বালিয়ে দিয়েছি নিজেদের
স্বচ্ছ উত্তপ্ত অনির্বাণ জ্বলছি আমরা,
আগেকার সেই বশম্বদ ইচ্ছাগুলো আমাদের মধ্যে পুড়ে মরছে
দেয়ালি পোকার মত ;
আমাদের সারা কাঠামোয় আগুন হয়ে আছে মাত্র একটি
উলঙ্গ ইচ্ছা :
উপরে নিশানা ক'রে ঠিক মাঝখানে মারব হাম্বর তুলে
খিঁচোনো রেখাগুলো খানখান হয়ে যাবে, একেবারে চুরমার
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে
তারপর ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হয়ে ঝ'রে পড়বে। (ভ্রূকুটি)

যেন হাত দিয়ে ধরতে-ছুঁতে পারি। এ যেন সেই আদিম জাতুমন্ত্রের সহোদর—যা শুধু বাসনার মধ্যে শেষ নয়, খোদ বস্তুকে মিলিয়ে দেবার স্পর্ধা রাখে।

জীবনকে দেখা। কিন্তু একটেরে করে নয়। দশ দিকে ফেলে দশ দিক থেকে দেখা। দেখার এই শর্ত অরুণ মিত্র তাঁর 'প্রান্তরেখা' গ্রন্থেও পূরণ করেছিলেন। কিন্তু 'উৎসের দিকে'র মত এত জমকালোভাবে, এত ঘনঘটা করে নয়। প্রেম আর প্রকৃতি, স্বদেশ আর স্বাধিকার, জয় আর পরাজয়, উৎসব আর হাহাকার, একাগ্রতা আর দ্বিধা, যেন এক তরঙ্গিত শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলে 'হাতে হাত দিয়ে মত্ত নৃত্যের ভঙ্গীতে'।

দেশ আর প্রেমাস্পদ একই ভালবাসার টানে মিলে যায়। একই উৎসে, একই উপমায় তারা একদেহে একাত্ম হয়ে ওঠে।

'আমি পলিমাটি ছুঁলেই বুঝি
নিজেদের জগতে এলাম
তোমার শরীরে অঙ্কুরের শিহর খুঁজি
আমার আলিঙ্গনের মধ্যে ছুর্বোধ্য বিস্তার সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে
আশেপাশে অসংখ্য ইশারায়
তোমার ঠোঁটের প্রত্যাশা উদ্ভিন্ন হয়
… … …
মানুষের আবেগে
জরাজীর্ণ স্মৃতিকে অস্বীকার ক'রে বলি

তুমি মঞ্জরীর মত জাগো
বলি ধানশীষ হও সর্ষের ঢেউ
বলি গভীর কল্লোল দিয়ে আমাকে জড়াও।' (ফসলের সুরে)

দেখা আর দেখানো অরুণ মিত্রের কবিতায় যেভাবে মিশ খেয়েছে, তার তুলনা বাংলা কবিতায় খুব বেশি নেই।

কবির কণ্ঠস্বর অরুণ মিত্রের কবিতায় অশরীরী আকাশবাণীর মত শোনায় না। পড়তে পড়তে মনে হয় পাশ থেকে কে যেন খুব চেনা একটা গলায় কথা বলছে। তারপর কখন যে গলায় গলা মিলে যায়, কখন যে হাতের মুঠোর মধ্যে হাত চলে আসে বোঝাই যায় না। আটপৌরে কথার ভেতর দিয়ে এই বিশাল পৃথিবীটা তার ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে ধুলো পায়ে সটান ঘরে উঠে আসে। সেই কণ্ঠস্বর চোখে কানে কথা বলে আমাদের চারদিক দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়। কিছুই মোলায়েম করে, রেখে-ঢেকে বলে না। কথাগুলো ঝড়ের বেগে আসে, ঝড়ের বেগে যায়। কণ্ঠস্বরটা যে বেত হাতে-করা টুলো পণ্ডিতের নয়, কথা শুনে তা বুঝতে দেরি হয় না।

অরুণ মিত্রের শব্দগুলোর মধ্যে থাকে এমনি একটি দামালো ডানপিটে, কিন্তু সমানে-সমান ভাব। অনেক সময় এমন দুম্ করে আসে যে চমকে যেতে হয়। কিন্তু ভাব চটে না। অরুণ মিত্র পুঁথির কবর থেকে শব্দ তুলে আনেন না। মুখর মানুষই তাঁর শব্দের কোষাগার। তাঁর কথাতেই বলা যায় :

'মুখের ভাষা যে ফুলের মতো জীবন্ত হতে পারে
তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয়।' (ফসলের সুরে)

চোখ খুলে দেখবার গুণেই কবিতায় এমন মন্ত্রের মতো কাজ হয়। আবছা-ভাবে আলগোছে দেখা নয়, তুলে বেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। নকলনবিসির একঘেয়ে পুনরাবর্তনে তা শেষ হয় না, স্বপ্নচালিত হয়ে সেই বাস্তব এক অনিবার্য রূপান্তরের দিকে মোড় ফেরে।

'ভ্রূকুটি' ('উৎসের দিকে') কবিতায় তার সূত্র :

'এখনও সেই ভ্রূকুটি খোদাই হয়ে আছে
বাইরে যখন আসি দেখি
কিন্তু আমরা তার প্রত্যেকটি রেখা আলাদা আলাদা করে
বেছে নিতে পারি চোখ দিয়ে,
আমাদের হাত নিস্‌পিস্ করে।

শুধু আলাদা করে দেখা নয়, মিলিয়ে মিলিয়ে দেখা। চোখ ধাঁধানো অরণ্যের

মধ্যে দিশে খুঁজে পাওয়া। এই বাছ-বিচার আছে বলেই অরুণ মিত্রের কবিতায় দু-চারটে আঁচড়েই শাদাকালোয় পুরোদস্তর ছবি ফুটে ওঠে। কান টানলে মাথা আসার নিয়মেই একটি ভাব আরেকটি ভাবকে টেনে আনে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর জটিল সম্পর্ক না জেনে এই কৌশল আয়ত্ত করা যায় না।

অরুণ মিত্রের সমস্ত কবিতাতেই এই সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। বন্ধুর দিকে হাত বাড়ানো, আততায়ীর দিকে আঙুল দেখিয়ে সনাক্ত করা।

'তাকে অনুভব করা যেত :
ক্ষেতের আলের কিনারে উইঢিবির ফোকরে
কারখানায় মেশিনের ইস্ক্রুপের খাঁজে
ডেস্কের উপর লেজারের জাব্দা পাল্লায়
তার মারমুখো অস্তিত্ব গরগর করত।
... ...
চিঠিপত্রে জমাখরচে দলিলদস্তাবেজে
কালো হলদে ডোরা
হাড়মাস চিবিয়ে-ফেলা শাসানি
একসঙ্গে পাহাড় হয়ে পুড়ছে।'

এই বাঞ্ছিত মৃত্যুর উল্টো পিঠে আছে বাঞ্ছিত জীবন। তাই মাঠঘাট কাঁপিয়ে আকাশ মাথায় করে হাঁক ওঠে :

'কে বাঁচে ?
ঘানি ঘোরার টালে
লাঙলের ফালে
লোহাগলানো আঁচে
কে বাঁচে কে বাঁচে ? কে ?' (চিতা)

পৃথিবীর চোখে চোখ রেখে দাঁড়াবার এই সাহসেই বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্ন এমন নিখুঁত হয়ে মিলতে পারে। তাই বুকে হাত দিয়ে বলা যায় :

'একটা মুহূর্তে তো এর বদল হবে
রক্তে মাংসে মাটিতে জলে সমস্ত মুখ সুডোল হয়ে উঠবে
কালো পর্দা সরিয়ে তোমাদের সদ্যম মূর্তি নেবে
হে পৃথিবী হে পুত্রকন্যা।'

এর শেষ কথাটা শুধু জলন্ত বিশ্বাসের নয়, শিয়রে-জাগা অতন্দ্র প্রহরীর :

'অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের চোখের পাতা পড়ে না।'
(ছয় ঋতু সঞ্চয় করি)

ফাড়া, তকতকে, ডগমগ, জলমোছা, ঝিলমিল, কাদায় কাদামাখা, পা গাড়া, গরগর, টাল : এসব শব্দ এমন লাগসইভাবে অরুণ মিত্র ব্যবহার করেন যে শব্দ আর নিছক প্রতীক থাকে না—সে জায়গায় বস্তুগুলো যেন শব্দকে ঠেলে ফেলে সশরীরে সামনে এসে দাঁড়ায়। শব্দগুলো শুধু শব্দ নয়, যেন চলমান সবাক ছবি।

অরুণ মিত্রের কৃতিত্ব এইখানে যে, নিজের সৃষ্টির মায়ায় তিনি বাঁধা পড়েন না। পুরনো ছবি তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে আসে না। সানন্দ বিস্ময়ে তারা আমাদের অভিভূত করে :

—দাঁতে দাঁত চাপা কথা সব টলতে থাকবে ; ইতস্তত যে ভয় জড় শুষে নেয় ; উপুড় হয়ে থাকে মাঠ ; সমবেদনার ভাষা হাঁতড়ে ফেরে দেয়ালে দেয়ালে ; উঠোনের ভালবাসার ভোর একমুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠবিড়ালীর মত পালায় অনেক দিনের আশা ; শুধু ভাসা-ভাসা কথার শূন্যে লেগে থাকে জলমোছা দৃষ্টি দুপুরের সূর্য হয়ে ; ছেলেভুলানো আসরে কাঠ পুতুলের একটা একরোখা ভঙ্গী শক্ত হয়ে থাকে যেন এখনি ছিটকে পড়বে বিক্ষোভে ; তাড়নায় আঁকাবাঁকা স্রোতোলি নদী সাপের মত মোচড়ায় ; কাঠকুটো আসবাব আবার বন্য হয়ে উঠবে ; ওরা কচি পাতার ঝিলমিল মুড়ে ঝিমোয় ; ঘুলঘুলি থেকে তারার আকাশ সরে গেল ; মনের মত সাধ যেন কাদায় কাদামাখা ; নিস্পন্দ মাটি থেকে তোমায় ফোয়ারায় ওঠাবো আমি ; উৎক্ষিপ্ত গানের শিস তীরের মত আকাশে বিঁধে থাকে ; ছায়া-আঁটা আঁধার-ফটকে অগ্রদূত হৃদয় ঘা দেয় ; এক দুর্দান্ত ভয় ওৎ পেতে থাকে ; দুমুঠো ভাতের স্বাদে চোখের জলের নুন এখনও মাখা আছে ; কড়িকাঠগুলো ঝুলত খাঁড়ার মত।—

এই চিত্রগুলো থেকেই বোঝা যাবে কিভাবে চঞ্চলতা আর গতির অস্থির ভঙ্গিতে দৃশ্যমান জগৎকে ধরা হয়েছে।

শব্দের মধ্যে এতখানি বেগ সঞ্চারিত করতে পারার কারণ শুধু এ নয় যে, অরুণ মিত্র মুখের ভাষাকেই কবিতায় বড়ো করে তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষার একটা নিজস্ব সম্পদ হল ধ্বনিবাচক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সবিস্তারে এ নিয়ে আলোচনাও করেছিলেন। কেতাবী বুলির কোলাহলে সে কণ্ঠস্বর ডুবে গিয়েছিল। ধ্বনিবাচক শব্দকে অবলম্বন করলে কবিতায়

কী পরিমাণ ওজস্বিতা এবং ব্যঞ্জনা আনা যায় কবিতায় অরুণ মিত্র তা বহুল ব্যবহারে প্রমাণ করেছেন।

কিন্তু জড়ের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এবং নির্বিশেষ ভাবকে আকার দিতে গিয়ে অরুণ মিত্র কোনো কোনো জায়গায় লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারেন নি। বেশি আঁটাআঁটি করতে গিয়ে বাঁধন ছিঁড়ে ভাবগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। সংহতির বদলে বিশৃঙ্খলা এসে তাঁর অভিপ্রায়ে বাদ সেধেছে। সে ব্যর্থতা ধরা পড়ে যখন তিনি বলেন : 'বুকের বাতা হাপরের মতো ফোঁসে' (অপরিমাণে'), 'অক্ষরের গুঞ্জনে প্রতিবিম্বে ঝলমল আকাশের আলিঙ্গনে' ('উৎসর্গ'), 'উড়ন্ত পাখায় কাঁপা হাওয়ায় হৃদয়ের ছন্দ যেন মাটির ঢেউ', 'সৌরভের রঙের উজাড় আলোয়' ('হৈমন্তী')। কোথাও একটিতে আরেকটির অনাকাঙ্ক্ষার দরুন, কোথাও বড়ো বেশি তফাতে থাকায় সহৃদয়তার ভাব যেন গড়ে উঠতে পারে নি।

তুলনায় পদ্যছন্দের চেয়ে গদ্যেই যে অরুণ মিত্রের হাত বেশী খোলে দুটি কবিতা পাশাপাশি রাখলে তা বোঝা যায়। পয়ার বাদ দিয়ে অন্য যেসব বাঁধাধরা ছন্দে তিনি লেখেন তাতে এত বেশি ভার চাপানো হয় যে পা যেন চলতে চায় না।

বহু জায়গায় অরুণ মিত্রের কবিতায় দিশে পাওয়া কঠিন হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিতা দিনের আলো নয়। এমনকি দিনের আলোও যে সব সময় সকলের কাছেই স্পষ্ট, তা বলা চলে না—কেননা তা না হলে পৃথিবীতে এমন লোক থাকে কী করে যারা চোখ থাকতেও কানা!

তা হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে কবিতা পড়তে গিয়ে কোথাও থেই হারিয়ে গেলে মন খুঁতখুঁত করে। কোথাও হাতড়ে হাতড়ে থেই খুঁজে পেতে হয়, কোথাও তা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। যেখানে হাত বাড়ালে এত কিছু পাওয়া যায়, সেখানে দু' চারটে নাগালের বাইরে থাকল বলে নালিশ জানাবো অতটা আদেখলে আমি নই।

পুরনো লেখাটা পড়তে পড়তে অরুণ মিত্রেরই পুরনো দুটো লাইন মনে পড়ল : "তৃণ কেন শূন্য করো? পোষাবে না পরে এতখানি মেহনত।…"

বিশ বাইশ বছর আগে আমার ঐ লেখায় আমি বিচরণ করেছি ডালে ডালে কিংবা পাতায় পাতায়। মূলে না যেতে পারার কারণ আমার সঙ্গতির অভাব।

'ঘনিষ্ঠ তাপ' কিংবা 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' পড়বার পর আবার যদি আমি লিখি। নতুন কী লিখব?

কড্‌ওয়েল বলেছিলেন কবিতা তারিয়ে তারিয়ে পড়া এক কথা, আর সমালোচনা করা আরেক কথা। সমালোচনায় কবিতার বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়। এই বাইরেটা হল মানুষবদ্ধ সমাজ।

পড়বার সময় আমি ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু নিজেকে বাদ দিয়ে সমালোচক করে ঘটকালির কাজ। ব্যাপার যদি এই হয়, তাহলে আগেই ঘাট মানছি।

আমার মুশকিল এই যে, অরুণ মিত্রের কবিতা যখন আমাকে ধরে হাজার চেষ্টা ক'রেও আমি নিজেকে ছাড়াতে পারি না। কিন্তু নিজের বুকে হাত দিয়ে বুঝি—এ কবিতার মূলে রয়েছে উজাড়-করা এক ভালবাসা। দূর মহাবিশ্বে, মাটির প্রতি ধূলিকণায়, অণুপরমাণু জুড়ে সেই ভালবাসা। চলতে চলতে দু'পাশের জীবন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আবার আমাদেরই হাতে ফিরিয়ে দেন হৃদয় মন্থন করা আবেগের ইন্দ্রধনু।

কেউ যদি আমাকে জিগ্যেস করে—কিন্তু কোথায় গেল 'লাল ইস্তাহার' আর সেই 'কশাকের গান'?

এর উত্তরের যেন বীজমন্ত্র পাই 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'—যখন পড়ি :

'কিন্তু কোনো সৌরভে আমি ভিড়লাম না
কোনো কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করল না,
কেননা আমার বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল পাথরে
এক অনমনীয় পাথরে।'

হয়ত দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়ানো এই বিশ্বাসই আমাকে টানে। যার মধ্যে মুখসর্বস্ব অমানুষিকতার বদলে আছে মানবিক রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শের জগৎ।

লাল ইস্তাহার দেয়ালে লটকানো আছে। কশাকের গান তো শুনলে। এবার চলে এসো 'ঘনিষ্ঠ তাপে'র এই গলিতে :

'পাড়ার মধ্যে দিয়ে এই গলি। বড় রাস্তার উপর যেখানে ইট আর পাথরগুলো প্রচণ্ড ক্ষমতায় ফাটো-ফাটো সেইখানে মুখ বাড়িয়ে নিশ্বাস নেয়। মার খেলেও মুখ সরায় না, কারণ বাতাস টানবার ঐ একটাই পথ।···মাঝে মাঝে একটা দারুণ ওলটপালট ঘটে। ভোরবেলার কুয়াশার মধ্যে সকলে এমন আলোড়িত হয় যে উদ্বেগের আর কোনো অবসর থাকে না। সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, যেন দিগন্তকে এক্ষুণি ভেঙে ফেলে নতুন করে বানাবে। দিনের আলো ফোটার দরকার নেই, পায়ের ঠোকায় যে চকমকি জলবে তাই যথেষ্ট। পাষাণে বুক বাঁধে এই গলি। তখন একে আর চেনাই যায় না।'

কিংবা চলে এসো 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' :

'সব আরম্ভ এখনও আমাদের ধমনীতে সঞ্চিত আছে,
তুমি থামতে চেও না
আমরা মুক্তির আভায় আবার আপ্লুত হব।'

জগৎ আর জীবনকে কে কোথায় দাঁড়িয়ে কিভাবে দেখে, কত তন্নিষ্ঠভাবে তা চক্ষুষ্মান আর শ্রুতিগোচর হয়—কবিতা তো সেটাই দেখায়। সমালোচকেরা কেটেছিঁড়ে কখনও এর সঙ্গে লাগিয়ে ওর থেকে পৃথক করে দেখান। প্রাণ দেওয়া ছাড়া তাঁরা আর সবই পারেন।

'পুরনো নতুনের টানে গদ্য পদ্য' কি অরুণ মিত্রের এজাহার না ফতোয়া?

অরুণ মিত্র বলেন বটে, 'অনেক বছর ধরে পাথরে পাথরে স্মৃতি বেশ ক্ষয়ে গেছে'—কিন্তু তবু সেই ধান দুলবার সময়, সেই হাপর, বাতা, কেরোসিনের কুপি থেকে থেকেই কড়া নাড়ে। অবশ্য 'কিছুই নির্ণীত হয় না।' পাথর ক্ষয়ে গেছে? তাতেই তো স্মৃতি পায় জুত করে বসবার জায়গা।

কারা তাঁর অন্তরঙ্গ? 'এই ভিড়ের মধ্যে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ।' তারা 'রক্তের দোসর' 'আরও উঁচুতে ওঠার জন্যে ব্যাকুল হয়েওআমাদের নেমে আসতে হয়েছিল এই সমতলে, আকাঙ্ক্ষার এই পোড়ামাটিতে। তারপরই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। অন্য কথা আর কে শুনবে? তবু আমি নতুন বৃষ্টি, পাখি, চোখের মণি এই সবের দিকে দেখালাম, বললাম, এরা হয়তো কোনোদিন সব খোঁজখবর আমাদের দেবে। কিন্তু আমার সে কয়েকটি কথা গভীর অন্যমনস্কতার ভিতরে তলিয়ে গেল।' (অন্তরঙ্গ : 'ঘনিষ্ঠ তাপ')

কিন্তু 'অন্ধকারের মধ্যেও চোখের পাতা পড়ে না'। তাই শেষ প্রহরে বলতে বাধে না : '···ফটকখোলা বাড়িটা বন্ধুত্বে জারিয়ে আছে। যে-ভয়গুলো প্রথমে জেঁকে থাকত, বুলা তাদের হেসে হেসে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার হাসির টানে মানুষের চোখমুখ কোনো পাঁচিলে আটকা থাকতে পারেনি।

'একগাদা ছেলেমেয়ে আড়ুগায়ে ধুলো মেখে তাদের মিতালিকে কেবলই জিজ্ঞাসায় তুলে ধরে। তারা জানে না, এই ছোট উৎস থেকে বেরিয়ে ভালোবাসা পৃথিবীর চওড়া মোহনায় বিস্তৃত হয়েছে।'

যদি বিশ্বাসের কথা ওঠে, তাহলে বলব ঘৃণার পিঠে এমনি ক'রে ভর দিয়ে অরুণ মিত্রের কবিতায় ভালোবাসা আমাদের মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। অরুণ মিত্রের কবিতায় তাই ঘৃণা থেকেও না থাকার ভাণ ক'রে মুখ লুকিয়ে থাকে।

পুরোনো নতুনের টানে গদ্য পদ্য

অরুণ মিত্র

প্রথমেই সবিনয় নিবেদনে বলা ভালো
অনেক বছর ধ'রে পাথরে পাথরে
স্মৃতি বেশ ক্ষ'য়ে গেছে, ফলে
পুরোনো নতুনে প্রায়ই জট লাগে
আমি নিশ্চিত বুঝি না
তারা কোন্ সীমান্তে পৃথক হয়েছে,
এই যেমন আকাশের জবাকুসুমসঙ্কাশ যদি
মনে জাগে অগ্নি আমি পূর্বাচলে
নিশান ওড়াতে চেয়ে হাত মুঠো করি,
অথচ তা কোনো আদিম উষার রঙ
আব্ছা কোণে লেগে আছে এখনো মোছেনি
কিম্বা হয়তো মনে হল কারো দু' চোখের পাতা
খুলে গিয়ে সংসারের স্নেহ ছড়িয়ে দিয়েছে,
কিন্তু একটু ঠাহর ক'রেই বুঝি আশেপাশে
টুক্‌রো টুক্‌রো ঘরবাড়ি প্রাচীন কীর্তিতে লট্‌কে আছে,
ভিটের ভ্যারেণ্ডা কণ্টিকারি প্রেমের সবুজ নিয়ে খেলে।
এই রকম। কোনো কিছুই নির্ণীত হয় না।

*

আমার অনেক জানাবার কথা থাকে। জানানো। কাকে জানানো? আমাকে, না, অন্য যারা ওখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশায় রয়েছে তাদের, না, একসঙ্গে আমাদের? সে যাই হোক, বলাটাই আসল। শুরু থেকে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কে আমার ভর নেবে? গদ্য? তা গদ্যকে স্বচ্ছন্দে ডাকা যায়। দেখেছি ডাকাডাকিতে সে বেশ সাড়া দেয়। তার প্রশ্রয়ে এক এক সময়, কি যে আশ্চর্য, ধমনীর রক্ত চল্‌কে ওঠে, চোখমুখ ঢেউয়ের ভিতরে প্রক্ষালিত হতে থাকে। অবিশ্যি হাড়ের ঠকঠকানিও ওঠে। তবু তার পেছনে প্রকাণ্ড দরজা খোলার শব্দ ফ্রেম ভেঙে সমস্ত শরীরটাকে ভুবনডাঙায় চারিয়ে দেয়।

অথবা পদ্যও ভিড়তে পারে, আমার ঐ নিবেদনের মতো। এমনকি তার

চেয়েও বেশি ক'রে। পদ্য। মেঝের ফাটল, সিঁড়ির নীচে পেল্লায় গর্ত আর সাবধানে পা টিপে টিপে একটা পল্‌কা সেতুর এধারে আমি অথবা তুমি কাছাকাছি আসবার জন্যে তুমি এবং আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের ঘুর লাগিয়ে দেখবে ব'লে সে মুখিয়ে থাকে। আমি বলতে পারি :

কোন্ রাস্তা যে কোথায় যায় এখন
বোঝা যায় না, কিসের আশায় আশায়
মাচায় পোড়ে হলুদ ফুল, উঠোন
টেমির আলোয় ছায়ার মেলা বসায়।

নয়ানজুলি ছাড়িয়ে গেলে ভাঙন
পায়ের আগে ক্রমেই মাটি খসায়,
কতই বা দূর জলঘূর্ণির লগন,
তোমার জাগা তেরাত্তিরের বাসায়।

এভাবে বলতে পারি। কিন্তু আরো যে বলবার থাকে। এভাবে সব সময় আমার বুকের রক্ত সেখানে জোয়ায় না যেখানটায় কোনো কপাল কি গাল কি এক রাশ চুল নয়তো খোয়া ইঁট ধুলো ঝুড়ি কি জোড়করা হাত কি ফাটা কৌটো কি একমুঠ চাল নয়তো শব্দ গলা থেকে ফুটপাথ থেকে থামের গা থেকে হঠাৎ বা অনেকক্ষণ ধ'রে আমার বুকের উপরে বা কাছে উষ্ণতায় থাকবার জন্যে, যেখানটায়।

*

শুরুর কথাই ভাবি। কোথায় শুরু? সে কি সকালের জল ছপছপ ঘাসে আর বিকেলের মাঠে যেখানে ছেলেরা প্রজাপতির সঙ্গে উড়ছে অথবা পা থেকে পায়ে পৃথিবীটাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে? নাকি সন্ধের আড়ালে যেখানে আর কিছু নেই শুধু ক্ষুদে দুটো চোখের উপর গুনগুন ক'রে ঝরছে পাপড়ি পালক ছবির রঙ? পুকুরপাড় থেকেও শুরু হতে পারে। খোলামকুচির চক্কর কিম্বা শাপলার দোলা লাগিয়ে জল দুপুরের মধ্যে ছড়ানো কলাপাতা ধুয়ে ভাত নেওয়ার পালা জুড়ে, ঝিমঝিম।

*

এঁটো কলাপাতার একেবারে ঢালাও নেমন্তন্ন। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা ধেয়ে আসে। তাদের গায়ের ঘষায় বাতাস দাউদাউ করে। পাতে হাত দেওয়ার আগে পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের আগুন গদা ভল্ল পাশুপত অর্ধচন্দ্র

হারেরেরে তুড়ুং ঠুকে ব'সে ক'টা গেরাস মুখে দিতে অঙ্গ জুড়িয়ে শেতল, তখন কুকুরদের গলা জড়িয়ে দিল্লেগি আতুতুতু ভালোবাসায় কলকল গলি ঘুঁজি নর্দমা। বাঁচার খুব জোশ আছে।

ঐ ভালোবাসার শহরপানে হাঁটো। আমি অনেককাল আগে বলেছিলাম শহরে প্রথম পা ফেলার কথা। কড়া রোদ্দুর ছিল এবং কার যেন মুখের পদ্ম ফুটেছিল। পুকুরের আর ক্ষেতের কাদা পোটলাপুঁটলি জাব্‌ড়ে ইস্টিশানের ছ্যাকরাগাড়ির চাকা বরাবর পুরোনো বাড়ির বাগানে বড় শিমুলগাছের তলায় থিতিয়ে রহস্যজনক গোল হয়েছিল। কিন্তু কোনো চারা জন্মায় নি। তবে পদ্ম ফোটার কথা এসেছিল কেন? তা আসতে পারে, তোমাকে আমার একদিন সেরকম বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। তখন শিউলি কুড়োবার সকাল। অঘ্রাণে শীতের রাতে সেই তোমাকে কাঁচের পর্দার সামনে দেখলাম, রাস্তার বাতিগুলো জলছে না বা জললেও নিভে যাচ্ছে, কিন্তু কাঁচের ওধারে খুব রোশনাই আর এধারে আমরা পরস্পরকে দেখবার চেষ্টায় কাঁচের উপর সেঁটে আছি যদি আলো আসে, যদি আয়নার মতো দেখা যায় উল্টোদিকের তার এক আয়নায় আলো ঠিক্‌রে অনেক দূর পর্যন্ত বীথির মতো একের পর এক ঘর গাছপালা জল ফুল তোমার মুখ বেড়ে ক'রে আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে যায় যদি, তাহলে পাপড়ি মেলার কথা ভাবতে পারি। কিন্তু কই, জলজলে আলো দেখছি ভিতরে, অথচ তা ফিরে আসছে না অন্ধকারে যেখানে আমরা ফুটপাথের ধসের ঠিক পাশে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছি, চুপচাপ একেবারে চুপচাপ।

*

অপেক্ষা করার কথা মনে হয়, কতবার করেছি তো।
গোরুর গাড়িতে একটা লম্ফ দুলতে দুলতে
রাতের ভিতরে ঢুকল, আমি দাওয়ার উপর থেকে
চেয়ে আছি, কে আমাকে দেখেছে স্থাপিত
এইখানে, কে কখন ফিরে আসবে,
হাজারটা আবিষ্কার সন্তাষণে খুলে যাবে;
প্রত্যেক শীষের দানা পেকে উঠলে
চোখের ঝিলিক খেলবে সমস্ত হাওয়ায়।
অনেক অপেক্ষা থাকে।

অবশেষে ট্রেন থামল প্রকাণ্ড শহরে
প্ল্যাটফর্মের ওধারে আরেক ট্রেন ছাড়ো-ছাড়ো,
এত খোঁজাখুঁজি এই কেন্দ্রে থিতোয় না,
একটা জলন্ত ভাঁটা হয়ে হ'য়ে ছোটে সামনে,
এদিকে সবুজ গাছগুলো একে একে মরে যেতে থাকে।

*

তোমার সঙ্গে দেখা হল। কই দেখা হল? আমাদের মুখ আমরা দেখতে পেলাম না। চকচকে কাঁচে, চামড়ার জেল্লায় চোখ কেবলই পিছলে পায়ে পায়ে এদিক থেকে ওদিক ওদিক থেকে এদিক যেমন লক্ষ্য নাচে কিম্বা জন্তুর সামনে হ'টে স'রে ঘুরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্ খোড়লে নামছে ওদিকটা কি কে জানে। শুরু আর শেষ কোথায়? সেই জন্যে গদ্য হোক পদ্য হোক এইখানটায় খুব আথান্তরে প'ড়ে যায়, আমাকে এমন কোথাও নিতে পারে না যেখানে আমি তোমায় ডাকতে পারি বুকে হাওয়া টেনে একটা ঘরমুখো রাস্তায় অভিযাত্রীর মতো পা বাড়াবার জন্যে ঠিক্‌রোনো এলোপাথাড়ি রঙ মেখে ভূত হ'য়ে সূর্য ওঠার বা ডোবার সময়ে যখন আর একটা রঙের ফোয়ারা খুলবার দিনক্ষণ বেশ স্পষ্ট আঁচ করা যায়। তাই অনিশ্চয়তার মধ্যে ভিজে মাঠ বিকেল ভোর ধানের ছড়া ফোটা পদ্মর সঙ্গে অপেক্ষার কথা এসে যায়। কিন্তু শুক্‌নো গেঁয়ো মাটি ঝেড়ে ফেলে এক জায়গায় উসখুস না ক'রে চেয়ে থাকতে থাকতে গা-গতর কেমন শক্ত লাগে আর রক্ত থম্‌কে গিয়ে ইচ্ছেগুলোকে এমন জমিয়ে দেয় যে কাঁচঘরের সামনে যেন প্রাচীন মূর্তি খাড়া হয় যা তুলে নিয়ে কোনো সময় হয়তো ভিতরে বসানো হবে। আমরা পাথর হতে এসেছি নাকি? কখন এসেছি, এখন, না, অনেককাল আগে? তাহলে এখান থেকেও শুরু হতে পারে যখন আমি ফুটপাথের ছ ইঞ্চি কিনারা ধ'রে সরতে সরতে বাঁক ঘুরে পেছন দিককার রঙচুট এলাকায় গিয়ে অন্য কোনো আলো পাওয়া যায় কিনা ভাবছি।

ব্যক্তিগত রচনা

প্রসঙ্গ : স্মৃতি

সমরেশ বসু

গতবছর—১৯৭৬-এর ৫ জুন আমি ক্যালকাটা মেডিকেল ইনস্টিটিউট বা ডায়মণ্ডহারবার রোডের ক্যালকাটা হসপিটালের ইনটেনসিভ কারডিয়াক কিওর ইউনিটে ভরতি হয়েছিলাম। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, হৃদরোগ ঘটিত কারণেই, চিকিৎসিত হবার জন্য সেখানে যেতে হয়। আমাকেও তাই যেতে হয়েছিল।

আমার নিজের অসুস্থতার বিষয়ে কিছু বলবার জন্য, এ প্রসঙ্গের অবতারণা করছি না। প্রসঙ্গ সম্পূর্ণই ভিন্ন। অন্য কোনো প্রসঙ্গ—সাহিত্য বিষয়ক কিছু লিখব বলেই প্রথমে ভেবেছিলাম। সে-রকম কিছু এই মুহূর্তে মনে আসছে না। 'বিভাব' কর্তৃপক্ষ আমাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে, লিখবার বিষয়-বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। স্বাধীনতার অপব্যবহার করবো না। কোনোরকম অনধিকার চর্চা করারও কিছুমাত্র উদ্দেশ্য আমার নেই।

সাহিত্যবিষয়ক কিছু আপাততঃ মনে না এলেও, যা আসছে, তা সাহিত্যিক ও সমকাল বিষয়ে কিছু বলবার একটা বিশেষ ব্যগ্রতা অনুভব করছি। এই সময়টায় আমি যে কেবল লিখেই ক্লান্ত বোধ করছি, তা না। অচিরাৎ যা কিছু পাঠ্যবস্তু হাতের সামনে এসে পড়ছে, তাও সাহিত্য পদবাচ্য কিছু না। সাংবাদিক পত্রলোয়ানবৃত্তির প্রতিশোধমূলক (এটাই হয়তো স্বাভাবিক।) কিছু কেচ্ছা কাহিনী, যা অনেকটা হরিদাসের গুপ্তকথার মতোই ছড়াছড়ি যাচ্ছে। জগৎটা আলাদা, ভাষা ও মনস্তত্ত্ব সাহিত্যরচনা থেকে বহু যোজন দূরে। এই ভাষা ও মনস্তত্ত্ব নিয়েও অনেকে যা রচনা করেন, তাঁরা তা সাহিত্য বলে দাবী করেন। করুন। ও বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়াটাও এই মুহূর্তে অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে। ও-বিষয়েও আমি বিরত থাকছি। শুধু না বলে পারছি না, ক্লান্ত, সত্যি বড় ক্লান্ত বোধ করছি, হাতের সামনে এই সব পাঠ্যবস্তু পেয়ে। কিন্তু কেউ তো আমাকে

মাথার দিব্যি দেয় নি, আরো পড়ে, আরো ক্লান্ত হবার জন্যে। অতএব আমি পশ্চাদপসরণ করছি।

আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে, ক্যালকাটা হসপিটালের আই সি. সি. ইউ-তে যখন ছিলাম, তার কয়েকদিনের মধ্যেই কবি ও গল্প লেখক, ঘনিষ্ঠ কনিষ্ঠ বন্ধু শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় গৌহাটিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সকালে প্রথম চা-পানের পরে, দুটি সংবাদপত্র পড়ার অনুমতি ডাক্তার দিয়েছিলেন, একদিন দেখলাম, আনন্দবাজার পত্রিকাটি আমাকে দেওয়া হয় নি, শুধু স্টেটস্‌ম্যান। সিস্টারকে ডেকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, বাঙলা ভাষার পত্রিকাটি কোথায়, দেওয়া হয়নি কেন? কেরালার তরুণী সেবিকাটি একটু যেন দ্বিধা করে বললেন, 'আজ সেই সংবাদপত্রটি আসেনি।'

অসম্ভব কিছু না। না আসার নানা কারণ থাকতে পারে। অনেক সময় বাড়িতে বসেও তো কাগজ পাই না। অতএব মনে করার কোনো কারণ ছিল না। মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে। কোনো কোনো ব্যাপারে আমাদের কিছু অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়। খচখচানিটা সেই অভ্যাসের। তার পরের দিনই আমাকে দেখতে এসেছিলেন সুখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে বোধহয় আমার বাড়ির লোকেরা কেউ সাবধান করার সময় বা সুযোগ পান নি। তাঁর মুখেই শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ পেলাম। শ্যামলের মুখেই শুনলাম, আগের দিনের আনন্দবাজারে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, কেন আমাকে আগের দিন সেই বিশেষ সংবাদপত্রটি দেওয়া হয়নি।

শ্যামলের মুখ থেকে শঙ্করের মৃত্যুসংবাদ শুনেই আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অনেক দিনের, অনেক রাত্রের ঘটনা আমার মনে পড়ছিল। শ্যামল চলে যাবার পরেই আমার স্ত্রী এসেছিলেন। আমি আদৌ ছিচকাঁদুনে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি আর চোখের জল সামলাতে পারিনি। আমার স্ত্রী স্বভাবতঃই আমার শরীর খারাপের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। সিস্টার এবং ডাক্তারও তাড়াতাড়ি আমার বেডের কাছে এসেছিলেন। আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। সকলেই আমাকে শান্ত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কেন না, আমাকে বাঁচতে হবে তো!

বাঁচতে হবে, যতোক্ষণ, যতোদিন পারা যায়, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার বুকে একটার পর একটা তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে। তার বেশি আমার

নিজেকে সামলানো সম্ভব ছিল না। শঙ্কর খুব একটা বিতর্কিত চরিত্র ছিল না, যতোটা ছিল অসহায় আর অবহেলিত। করুণ, এক কথায়, ওর দীর্ঘদেহের সতেজ চলাফেরা আর জোরালো কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও। শঙ্করকে ভবিষ্যতেও অনেককাল মনে রাখার আমার অনেক ব্যক্তিগত কারণ আছে, সে কথা ভবিষ্যতেই বলবো।

আই. সি. সি. ইউ-তে থাকাকালীন, আমার অনেকগুলো মানসিক চিন্তা ভাবনা রীতিমতো নাড়া খেয়েছিল। আমার সামান্য জীবনের ক্ষেত্রে, সে-সব খুবই সুদূরপ্রসারী। হঠাৎ শুনতে পেলাম, সেই আই. সি. সি. ইউ-তে অত্যন্ত স্বল্পকালের জন্য বুদ্ধদেব বসুও ছিলেন, এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তৎক্ষণাৎ আমার চোখের সামনে কেওড়াতলা শ্মশানের ছবি ভেসে উঠেছিল। মৃতাবস্থায় তাঁকে সেখানে শেষবার দেখেছিলাম। শুনেছিলাম, সেরিব্রিয়াল থ্রম্বসিসে তিনি মারা গিয়েছেন।

আই সি. সি. ইউ-তে আমার তখন প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। একদিন রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। ঘুমের ওষুধ খেয়েও না। ডঃ সুনীল সেন রাত্রে শেষবারের জন্য রুগীদের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ শেষ করে চলে গিয়েছেন। সিস্টার আলো নিভিয়ে দিয়েছিলেন, পর্দা টেনে দিয়েছিলেন। কেন যে ঘুম আসছিল না, কে জানে? আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আই. সি. সি. ইউ-এর কোনো কোনো সিস্টার খুবই সতর্ক। এমন কি চুপচাপ শুয়ে থাকা কোনো রুগী বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে, তাও যেন তাঁরা টের পেয়ে যান। এরকম একজন সিস্টার আমার শিয়রের কাছে এসে বলেছিলেন, 'কী হয়েছে আপনার (ইওর—যে অর্থেই নেওয়া যাক), ঘুম আসছে না কেন? কোনো অস্বস্তিবোধ করছেন?'

বলেছিলাম, 'না, কোনো অস্বস্তিই বোধ করছি না। ঘুম আসছে না।'

কেরালার তরুণীটি হেসে, চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বাড়ির কথা মনে পড়ছে?'

আমি হেসেই জবাব দিয়েছিলাম, 'না, বাড়ির কথা ভাবছি না।'

সেই সময়েই আই. সি. সি. ইউ-এর সর্বক্ষণের ভারপ্রাপ্ত তরুণ ডাক্তার যিনি ছিলেন, তিনি এসেছিলেন। কপালে মাথায় হাত দিয়েছিলেন। হাতের নাড়ি টিপে দেখেছিলেন, আর সবসময়েই যে-পর্দার ওপরে বৈদ্যুতিক কার্ডিওগ্রাফের সংকেত সবুজ রেখায় তরঙ্গায়িত হচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'ভালোই তো আছেন। ঘুম আসছে না কেন? গল্প করার ইচ্ছে হচ্ছে?'

হেসে বলেছিলাম, 'করুন না, শুনি।'

'আপনি কি জানেন, বুদ্ধদেব বসু এখানে ছিলেন?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমি অবাক! না তো! ডাক্তার বলেছিলেন, 'সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বুদ্ধদেব বসুকে এখানে আনা হয়েছিল। আমাদের যতোটা চেষ্টা করার সবই করেছিলাম। কিন্তু মনে মনে খুব অবাক হয়েছিলাম, কেন না, আমার মনে হয়েছিল, প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই তিনি মারা গেলেন।'

বিনা চিকিৎসায়? কেন? আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'সেই "কেন"র জবাবটা তো আমাদের জানা নেই। তাঁকে যখন আমাদের এখানে আনা হয়েছিল, বুঝেছিলাম তিনি খুব মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এটা পরিষ্কার বুঝেছিলাম, তিনি বেশ কিছুকাল ধরেই অত্যন্ত বিপদ্‌জনকভাবে অসুস্থ ছিলেন। অনেক আগেই তাঁর চিকিৎসা শুরু হওয়া উচিত ছিল। জানি না, কী কারণে তা হয় নি। অন্য কারো কথা হলে বলতে পারতাম, নিতান্ত অবহেলা, অর্থের অভাব, এই সব। তাঁর ক্ষেত্রে সে-রকম ভাবতে পারি নি। আপনিই বলুন না, সে-রকম ভাবা কি সম্ভব?'

আমি কোনো জবাব দিতে পারি নি। দেওয়া সম্ভবও ছিল না। কতগুলো মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। অসহায় বিস্ময়ে আর অস্বস্তিতে আমি চুপ করেছিলাম। তাকিয়েছিলাম ডাক্তারের মুখের দিকে। ডাক্তার আবার বলেছিলেন, 'আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানেন। বুদ্ধদেববাবুকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যখন এখানে আনা হলো, তখনো তাঁর নিঃশ্বাসে হাল্‌কা সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। ভাবাই যায় না।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারের কী মনে হয়েছিল, হঠাৎ একটু হেসে বলেছিলেন, 'গল্প করতে গিয়ে বোধহয় আপনার মনটাই খারাপ করে দিলাম। জানেন, এখানে উত্তমকুমারও বেশ কয়েক দিন ছিলেন। সেটা ঠিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে না, ওঁর স্পণ্ডেলাইটিস হয়েছিল, কিন্তু···'

যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর কিছুই শুনছিলাম না। ডাক্তার আমার জন্য সেই রাত্রে আর একটি ঘুমের বড়ি বরাদ্দ করে চলে গিয়েছিলেন। একটি মুখই তখন আমার চোখের সামনে ভাসছিল। আর একটি একতলা বাড়িও। সেই নাকতলায়। আমার কাছে নৈহাটির থেকেও যেন দূরে। আমার নৈহাটির বাড়িতে, কলকাতা থেকে যেতে নিয়মিত অভ্যস্ত, বা ইলেকট্রিক ট্রেনে দ্রুত পৌঁছে যাই, এই কারণেই বোধহয় নাকতলা আমার কাছে ছিল অনেক দূরে। এত দূরে কেন তিনি ছোট

বাড়িটি করেছিলেন? আমার মতোই সবাই জানে, বুদ্ধদেব বসু প্রাসাদোপম অট্টালিকা নিজের জন্য তৈরি করেন নি। অনেক গৃহস্থের থেকে, অনেক সামান্যতর ছিল তাঁর বাসস্থান।

তাঁর কোনো গাড়ি ছিল না, এটা ভূ-ভারতের সবাই জানতো। দূর থেকে পত্রিকা আর প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের একমাত্র যন্ত্রটি ছিল টেলিফোন। কোনো কারণে মধ্য কলকাতা অঞ্চলে তাঁকে আনতে হলে, অনেক সময়েই টেলিফোনে সাগরদাকে (সাগরময় ঘোষ—সম্পাদক, দেশ সাপ্তাহিক) বলতে শুনেছি, গাড়ির কোনো ব্যবস্থা করা যায় কী না। হয়তো আরো কারো কারোকে বলতেন। আমার এক এক সময় মনে হতো, তিনি যেন এক নিঃস্ব তপোধন, অথবা নিজেকে অনেক দূরে স্বেচ্ছায় করে রেখেছেন অন্তরীণ।

একাধিকবার তাঁর নাকতলার গৃহে গিয়েছি। গিয়েছি তো দল বেঁধে, হৈ চৈ আনন্দ করতে। কেউ বলবে না, তাঁর চোখ ছিল ভাসা ভাসা। কিন্তু শিশুর মতো কৌতুকোজ্জ্বল, অথচ গভীর। মাথায় বড় বড় ধূসর চুল। হাসি কাকে বলে। কথা বলার একটি বিশেষ ভঙ্গি ছিল। অননুকরণীয়। বুদ্ধদেব বসুর বাক্‌ভঙ্গিমা, উচ্চারণ। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মীনাক্ষী, জামাতা জ্যোতির্ময় দত্ত, সুনীল, (গঙ্গোপাধ্যায়), করুণাশঙ্কর, মালবিকা, পাপ্‌পা-ওঁর ছেলে, অবিশ্যিই সাগরদা, আমাদের সকলের হৈ চৈ গানের সঙ্গে তিনি অনায়াসে মিশে যেতেন, উচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়ে উঠতেন। গৃহিণী, উপন্যাসিক প্রতিভা বসু যে সকলের মধ্যে প্রাণ প্রবাহিনী রূপে থাকতেন, এ তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। আমাদের হাতে খাবার তুলে দিতেন কে?

অনেক কথাই তাঁকে নিয়ে বলতে পারি। থাক্। আমি তাঁর জীবনধারণ আর অবস্থার কথাই ভাবছিলাম। যদি বলি, তাঁকে আমি ঋষিতুল্য জ্ঞান করতাম, আমার পক্ষে সেটা মোটেই বেশি বলা হবে না। কী নিরলস ছিলেন তিনি তাঁর ভাবনা চিন্তায় কাজে, যার প্রতিটি ফলই আমরা ভোগ করছি। তিনি আদৌ ধনবান ব্যক্তি ছিলেন না। তথাকথিত আভিজাত্য? ও-সব বোধের ভণ্ডামি, তাঁর ক্ষেত্রে ছিল অকল্পনীয়।

তিনি ভারত সরকারের এ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁকে আমি জীবিতাবস্থায় শেষ দেখি, সরলা মেমোরিয়াল হলের মঞ্চে এবং উইংস্-এর ধারে। হলে তিনি আসতে পারেন নি। সে-বছর আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাৎসরিক সাহিত্যের পুরস্কারের সঙ্গে, পত্রিকার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে,

তিনজন সাহিত্যিককে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

সাগরদা বুদ্ধদেব বাবুকে নিজে গিয়ে নাকতলা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। পুরস্কার ঘোষণার মুহূর্তে, তিনি পিছনের দরজা দিয়ে মঞ্চে এসেছিলেন। আমার মনে আছে, তিনি সাগরদাকে বলেছিলেন, 'সাগরবাবু, এই সময়ে এ টাকার মূল্য আমার কাছে প্রভূত।' আর বারেবারেই তিনি প্রতিভা বসুর অসুস্থতার কথা বলছিলেন।

তিনি নিজে কি সুস্থ ছিলেন? তাঁকে কেবল অসুস্থই দেখাচ্ছিল না। আমি দেখছিলাম, তাঁর পা কাঁপছে। কয়েকবারই তাঁর পা থেকে স্যাণ্ডেল খুলে খুলে যাচ্ছিল, এবং তা যেন তিনি সম্যক অনুভবও করতে পারছিলেন না।

হসপিটালে আই. সি. সি. ইউ. থেকে আমাকে যখন সাততলার কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তখন একদিন আমাকে একজন দেখতে এসেছিলেন। তিনি বুদ্ধদেব বসুর ঘনিষ্ঠ স্নেহভাজন একজন কবি, আমার থেকে কিঞ্চিদধিক বয়স্ক। ওখানকার ডাক্তার আমাকে যা বলেছিলেন, তাঁকে আমি সে-সব কথা বলেছিলাম। দেখেছিলাম, সেই কবির চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'ডাক্তার মিথ্যে কিছু বলেননি। বুদ্ধদেব বসু যতোদিন বেঁচেছিলেন, তাঁর প্রাণপ্রাচুর্যতা নিয়েই বেঁচেছিলেন।'

ঘনিষ্ঠ মহল জানেন, প্রতিভা বসুকে এখনো কতোটা পরিশ্রম করতে হয়। জীবনধারণ খুব সহজ ব্যাপার নয়। আর বুদ্ধদেব বসু তাঁর জীবিতকালে, কাব্যে ও সাহিত্যে নিরলস জীবনচর্চা করে গিয়েছেন। বিলাসিতা তো অনেক দূরের কথা, আরাম তাঁর কাছে সত্যি হারাম ছিল।

এখন আমি সেই সব মহদাশয় শিল্পী সাহিত্যিক কবি রাজনীতিবিদ্ সংস্কৃতিবিদ্দের কথা ভাবি, যাঁরা তাঁকে বলতেন সি. আই. এ-র লোক। তাঁদের লেলিয়ে দেওয়া অর্বাচীন সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা ভাবি। আজ যাঁরা প্রগতি আর সর্বহারাদের নামে, সর্বহারাদের চামড়ায় ডুগডুগি বাজিয়ে, এখানে সেখানে নানারকম মুচলেকা দিয়ে, ভারতের নানাস্থানে বাসস্থান করে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে ঢালাও জীবনের স্ফূর্তিতে সাঁতার কাটছেন, তাঁদের মুখেই তো একদা আমি ওই কথাটা শুনেছি। এখনো শুনে থাকি। এঁরা বোধহয় ভাবেন, ইতিহাস ওঁদের বাঁদী। সত্যি কি তাই? দেশের মানুষ কি এমনই অন্ধ কালা আর বোবা?

চিরকাল বোধহয় এই মিথ্যা ঢাকের বোল বাজিয়ে বাজিমাত করা যাবে না। ইরাণের সেই মহিলা কবি তাহেরা শফরজাদীর কবিতার একটি লাইন আমার মনে পড়ছে। ইতিহাসকে যাঁরা নিজেদের বাঁদী ভাবছেন, তাঁদের উদ্দেশে, লাইনটি খুবই উপযুক্ত :

'আমি প্রতিরাত্রেই তোমার জন্য শয্যায় অপেক্ষা করছি
হাতে আমার শাণিত ছুরি।'…*

* কবিতা পংক্তির অনুবাদ একান্ত আক্ষরিক না।

প্রবন্ধ

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শশধর তর্কচূড়ামণি

[বিভাবের গত মার্চ সংখ্যায় "পুরাতনী" বিভাগে প্রকাশিত শ্রীঅলোক রায়ের "রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শশধর তর্কচূড়ামণি" রচনাটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমরা গৃহী, সন্ন্যাসী ও সুধী পাঠকসমাজের কাছ থেকে বহু চিঠি পাই। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দও লেখাটি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিভাবের পরম সুহৃদ ও ভারতবিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ সুপ্রিয় ভট্টাচার্যই লেখাটির কথা প্রথম স্বামীজীর গোচরে আনেন ও বিভাবের তরফ থেকে মার্চ সংখ্যাটি লোকেশ্বরানন্দজীকে দিয়ে আসেন। এরপর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের রামকৃষ্ণ ভক্তদের ঐ সংখ্যাটি সংগ্রহের জন্য এত আগ্রহ দেখা দেয় যে কয়েকদিনের মধ্যেই বিভাবের মার্চ সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

১৫ই জুলাই স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ডঃ সুপ্রিয় ভট্টাচার্যকে লেখেন তিনি ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে শ্রীঅলোক রায়ের ওই বিতর্কমূলক রচনাটি সম্পর্কে মতামত শীঘ্রই জানাচ্ছেন। পাঁচদিন পরে ২০শে জুলাই জ্যোতির্ময় বসু রায় (এককালের আনন্দবাজার পত্রিকার বিখ্যাত চিত্রসাংবাদিক— এখন স্থায়ীভাবে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে আছেন) ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে চিঠির আকারে এই প্রতিবেদনটি পাঠান। বিষয়গুরুত্ব বিবেচনায় রচনাটি আমরা আলাদা প্রবন্ধ হিসাবেই প্রকাশ করলাম। ডঃ ভট্টাচার্যকে লিখিত স্বামীজীর মূল চিঠিটও সঙ্গে প্রকাশিত হলো—সম্পাদক]

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
GOL PARK CALCUTTA 700 029 INDIA

Phone : 46-3431 (4 Lines) Gram : Institute Calcutta
Secy/Misc/5(2)/77/632 15 July, 1977

Dear Dr. Bhattacharjee,

I have received your letter of 17 June, 1977, with its enclosure. I shall shortly send you a reply to the article to which you have drawn my attention. I will send the reply to you which you may forward to the Editor of the journal in which the article has appeared.

Yours sincerely,
Sd/— Swami Lokeswaranan da

জ্যোতির্ময় বসু রায়ের নিবেদন

"বিভাব" পত্রিকার বিশেষ সংযুক্ত সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৭৬ ও জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭৭) "রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শশধর তর্কচূড়ামণি" শীর্ষক একটি প্রাচীন রচনার পুনর্মুদ্রণ ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা পড়লাম। এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য জানতে চেয়ে আপনারা উদার সাংবাদিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তার জন্য সাধুবাদ জানাই।

বিষয়টির দুইটি প্রধান দিক। এক, শশধর তর্কচূড়ামণি রামকৃষ্ণদেবকে কতখানি উন্নত সাধক মনে করতেন; দুই, তর্কচূড়ামণির সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের যে-কথোপকথন "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" মুদ্রিত, তার সত্যতা যাচাই। প্রথম দিকটি সম্বন্ধে উক্ত রচনায় উদ্ধৃত তর্কচূড়ামণির চিঠিখানিকে শেষ কথা হিসাবে ধরলে রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কী, সে-সম্পর্কে তর্ক থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সেখানে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তর্কচূড়ামণির "উদ্যোগে প্রকাশিত" এবং তাঁর অনুরাগী ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত "বেদব্যাস" পত্রিকায় আছে, "তিনি (তর্কচূড়ামণি) বলিতেন 'বর্তমান সময়ে এরূপ (রামকৃষ্ণদেবের মত) উচ্চ-অঙ্গের ভক্তির সাধক অতি বিরল।' সময়ে সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 'লোকটাকে সাধারণে চিনিতে পারিল না, পারিবারও কথা নহে।' ...একদিন পরমহংসের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'পরমহংসের অপূর্ব অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হয়, ভারতে এখনও এরূপ লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন!...'" (মাঘ, ১২৯৪ / ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮)। এই মনোভাবের সঙ্গে তর্কচূড়ামণির উল্লিখিত চিঠির ভাষা মেলে না। কারণ, উক্ত পত্রে তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছেন: "...তিনি (রামকৃষ্ণদেব) কোনপ্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং অধ্যাত্ম বিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয় বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয় বা তৎপ্রাপ্তি-সাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না। তাঁহার যাহা বিদিত ছিল, তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্র বিষয়ে যাহারা একেবারেই অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই তাহা উপযোগী হইতে পারে ও হইত। রামকৃষ্ণ কথামৃত দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি শাস্ত্রাদি না জানিলেও কেবল গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজের অনুষ্ঠান করিয়া অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন...এবং ভক্তিরাজ্যেও তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু সে অনুষ্ঠান বা ততটুকু ভক্তিশিক্ষা অনেকের আবশ্যক বা উপযোগী হইলেও সকলের নহে।"

চিঠির অন্যত্র আছে "তাঁহার উন্নতি কি পরিমাণ হইয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন।...তাঁহার (যে) সমাধির ভাব হইতে দেখিয়াছি, তাহা সমাধির নিয়মানুসারে হয় নাই।" লৌকিক বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু "অধ্যাত্ম-বিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয় বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয় বা, তৎপ্রাপ্তি-সাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না"—তর্কচূড়ামণির এই মন্তব্যে আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। ভাবছি, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সেকালের দিকপাল মনীষীরা (যাঁরা অধিকাংশই যেচে তাঁর কাছে গিয়ে মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাঁর মুখনিঃসৃত অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ শুনতেন, যেখানে তিনিই থাকতেন একমাত্র বক্তা আর সকলেই শ্রোতা) আজ জীবিত থাকলে তাঁদের কাছে এ-প্রসঙ্গটি তোলা যেত। অবশ্য সুখের বিষয়, তাঁদের অনেকের সাক্ষ্যই আজ আমাদের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। তবে জানি না, বেঁচে থাকলে তর্কচূড়ামণি স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষ্যকে কতখানি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতেন। আশঙ্কার কারণ, প্রথমত, বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য। দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দ তো আর নিয়মিত টোলে গিয়ে শাস্ত্রের পাঠ নেননি।

তর্কচূড়ামণির মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের "যাহা বিদিত ছিল তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্র বিষয়ে যাহারা একেবারেই অজ্ঞ তাহাদের পক্ষেই তাহা উপযোগী হইতে পারে ও হইত। রামকৃষ্ণ কথামৃত দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।" এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বোধ করি। কারণ 'কথামৃতের' যাঁরা বিদগ্ধ পাঠক তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেকটি কথার অদ্ভুত শাস্ত্র-সমর্থন দেখে অবাক হন। সরল, সাধারণ ভাষায় হিন্দুশাস্ত্রের নিগূঢ়তম সত্যকে যে অপূর্ব ভঙ্গীতে তিনি প্রকাশ করেছেন তা বর্তমান যুগের বিদ্বজ্জনের কাছে এক পরম বিস্ময়। আমরা অবশ্য এতে বিস্মিত বোধ করি না কারণ, এ ভারতবর্ষের ট্রাডিশন। ভারতের আদি ও শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদ পাণ্ডিত্যপ্রসূত নয়, উপলব্ধিপ্রসূত। মানুষের জ্ঞানের যেখানে সমাপ্তি, অধ্যাত্মক্ষেত্রে "বিজ্ঞানের" সেখানেই সূচনা। শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বের প্রধান অধ্যাত্মশাস্ত্র ও ধর্মনায়কদের ক্ষেত্রেও এ-কথা সমভাবে প্রযোজ্য। নিজ বক্তব্যের সমর্থনে "রামকৃষ্ণ কথামৃত দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন"—এ-কথা বলে তর্কচূড়ামণি কিন্তু প্রকারান্তরে "কথামৃতের" তথা শ্রীমা'র প্রতিবেদনের authenticity সম্পর্কে একটি certificate দিয়ে ফেলেছেন।

"বেদব্যাস" পত্রিকার উল্লিখিত উদ্ধৃতি (যেখানে রামকৃষ্ণদেবের গুণকীর্তনে তর্কচূড়ামণি স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ; রামকৃষ্ণদেবকে দেখে, মনে হয়, তিনি বিস্ময়ে

অভিভূত) আর তাঁর আলোচ্য চিঠির সুরে যে-বৈষম্য রয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। "বেদব্যাস" পত্রিকায় উক্ত সংবাদ প্রকাশের তারিখ ১৮৮৮ সাল (রামকৃষ্ণদেবের স্থূল শরীর ত্যাগের প্রায় দুই বছর পরে) এবং তর্কচূড়ামণির উল্লিখিত পত্রের তারিখ ১৯২১ সাল। অনুমান করা চলে, এই দুইটি ঘটনার অন্তর্বর্তীকালে তর্কচূড়ামণির মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। কেন পরিবর্তন হল, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। তবে এখানেও অনুমানের আশ্রয় নিলে মনে হয়, "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" তর্কচূড়ামণির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে সংলাপ (প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৪০) প্রকাশিত হয়েছে, সেই অংশ পত্রলেখকের মনঃপূত হয়নি। এই কারণে রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তাঁর মনোভাবে বিরূপতার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

অবশ্য শশধর তর্কচূড়ামণি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 'পরমহংস' আখ্যার অধিকারী মনে করতেন কি করতেন না (যদিও "বেদব্যাস" পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে তর্কচূড়ামণি রামকৃষ্ণদেব প্রসঙ্গে "পরমহংস" শব্দটিই ব্যবহার করতেন), শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিকে "মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের ফল" অথবা সমাধিশাস্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত হিসাবে তিনি বিচার করতেন কিনা, এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে লাভ নেই। তর্কচূড়ামণি এ-বিষয়ে যখন যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়ে থাকুন না কেন, তাতে মূল সত্যের কোন বিকার ঘটা সম্ভব নয়। কেউ যদি সত্যকে উপলব্ধি না করে থাকেন, তবে সে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি—সত্য তো সেই কারণে খণ্ডিত হয়ে যায় না। অতএব তর্কচূড়ামণি যদি রামকৃষ্ণদেবকে "অবধূত" আখ্যার অধিকারী ভেবে কখনও শান্তি পেয়ে থাকেন, তবে তার জন্য অনুযোগ করব না, বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ বোধ করাও হবে অসমীচীন। এ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। রামকৃষ্ণদেবকে তাঁর সমকালের কয়জন ঠিক ঠিক বুঝেছেন? ("বেদব্যাস" পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জেনেছি, এ অনুযোগ স্বয়ং তর্কচূড়ামণিরও।) আজও কি সকলে তাঁকে অথবা তাঁর আবির্ভাবের তাৎপর্য ঠিক ঠিক বুঝেছেন? না বুঝেও কি অনেকে মতামত প্রকাশ করেন না?

তবে প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন তর্কচূড়ামণি সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখেছিলেন এবং অভিভূত হয়েছিলেন। এই তথ্য "বেদব্যাস" পত্রিকা থেকেই পাওয়া যায়। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর "রচনা পরিচয়" প্রসঙ্গে শ্রীঅলোক রায় সম্ভবত বেশী গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। যাই হোক, "বেদব্যাস" পত্রিকায় প্রকাশিত তর্কচূড়ামণির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাতের সংবাদের প্রতিবেদনটি এখানে উদ্ধার করছি:

"একদিন আচার্য্যদেব (তর্কচূড়ামণি) তাঁহার কলিকাতার আবাস-ভবনে বহুতর ধর্মপিপাসু শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্য্যদেব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই, অন্য কোনরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যেমন উপবেশন করাইতে যাইবেন অমনি দেখেন পরমহংস অচৈতন্য,—একেবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্যদেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া অনিমেষলোচনে পরমহংসের সেই সমাধিপরিমার্জিত প্রফুল্ল মুখকমলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। গৃহ নিস্তব্ধ, কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই।" (মাঘ ১২৯৪ / ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮)।

"বেদব্যাস" পত্রিকায় ১৮৮৭ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটিও প্রণিধানযোগ্য: "এই নিরাশায় ঘোর অন্ধকারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় যখন ভাবিতে থাকি তখন সুদূরে আশার দুই একটি ক্ষীণালোক দেখিতে পাই। দেখিতে পাই ভারত-জননী এখনও প্রাতঃস্মরণীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাচরণ, রামানন্দ, ত্রৈলঙ্গ, ভাস্করানন্দ প্রভৃতির ন্যায় কৃতী পুত্র প্রসব করিতেছেন। অহো! আজ আমরা যে মহাত্মার জীবনচরিত লিখিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, এইরূপ ভক্তের সংখ্যা যদি ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে কি এই সোনার ভারতের এই দুর্দশা থাকিত! কখনই না।

রামকৃষ্ণকে লোকে চিনিয়াও চিনিল না, হাতে পাইয়াও হেলায় হারাইল। রামকৃষ্ণ সূত্র অভ্যাস করেন নাই, তন্ন তন্ন করিয়া ভক্তিতত্ত্বেরও বিচার করেন নাই। ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি একেবারে 'নিরক্ষর' ছিলেন। অথচ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পর সেরূপ ভগবদ্‌ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রামকৃষ্ণ যেরূপ অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে তাঁহাকে কোনরূপেই মানুষ বলিতে সাহস হয় না। এই মহানুভব ভক্তির অবতার রামকৃষ্ণকে যিনি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন রামকৃষ্ণের অমানুষী ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়াছেন।" "বেদব্যাস" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, আমরা যেন মনে রাখি, তর্কচূড়ামণির বিশেষ অনুরাগী। অতএব পত্রিকাটিতে

প্রকাশিত ওই দুই প্রতিবেদনে তর্কচূড়ামণির অভিমতই বহুলাংশে প্রতিফলিত, এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয়। পরে হয়তো তর্কচূড়ামণির মতের পরিবর্তন হয়েছিল। তার সম্ভাব্য কারণ আমরা আগেই নির্দেশ করেছি।

এইবার বিষয়ের দ্বিতীয় দিকটি দেখা যাক। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" প্রকাশের পর তর্কচূড়ামণি কিছু অংশের প্রতিবাদ করেন—বিশেষত যে-অংশে "চাপরাশ" প্রসঙ্গ আছে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য : কথামৃতকার শ্রীম তাঁর রচনায় একান্ত সত্যনিষ্ঠ। তিনি রামকৃষ্ণদেবের মুখনিঃসৃত ভাষাও যথাযথ এবং অবিকৃত রাখতে একান্ত যত্নবান ছিলেন (তর্কচূড়ামণির চিঠিতে এর পরোক্ষ স্বীকারোক্তি রয়েছে), যে-কারণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-উচ্চারিত অমার্জিত (এমন কি এখনকার বিচারে যা মুদ্রণের অযোগ্য) শব্দও বদলাননি। তাঁর সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন কটাক্ষও তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। শ্রীম নিয়মিত দিনপঞ্জী লিখতেন, রামকৃষ্ণদেবের প্রতিদিনের কথা সংক্ষেপে লিখে রাখতেন রাত্রে—যা পূর্ণাঙ্গ আকারে পরবর্তীকালে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" রূপে প্রকাশিত হয়। সে-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের এই রকম একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় তাঁর ভুল হওয়া সম্ভব নয়। যদি এ-বিষয়ে শ্রীম'র বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত, তবে তর্কচূড়ামণির প্রতিবাদের পর তিনি নিশ্চয় পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করে দিতেন। তা যখন করা হয়নি, তখন নিঃসংশয়ে বলা যায় "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের" উক্ত বিবরণ নির্ভুল। প্রাসঙ্গিক অংশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আচরণ ও সংলাপ তাঁর অনন্য চরিত্রের সঙ্গেও সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া, "চাপরাশ" অর্থাৎ "ঈশ্বরের অনুমোদন" ভিন্ন নিছক পাণ্ডিত্যের কোন স্থায়ী লোককল্যাণ হয় না—এ তো রামকৃষ্ণদেবের একটি অতি পরিচিত উপদেশ। "কথামৃতে" সমসাময়িক বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন পরিবেশিত হয়েছে এবং উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনেকেরই জীবৎকালেই তার অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র তর্কচূড়ামণি ছাড়া আর কেউ কথামৃতকারের প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে জানি না। অবশ্য শোনা যায়, মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীম'র প্রতিবেদনে তাঁর সম্পর্কিত অংশ স্বীকার করেননি। কিন্তু এই দু'জন ছাড়া অন্যান্য অসংখ্য ব্যক্তির প্রতিবাদও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীম তাঁর বিবরণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য শুধু যে অবিকৃত রাখতেন তা-ই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উচ্চারিত শব্দেরও হেরফের ঘটতে দিতেন না। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঠকরা তার প্রমাণ ওই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পাবেন।

সেখানে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গ্রাম্য কথ্যভাষাকে মার্জিত রূপ দেবার কোনও রকম চেষ্টা করেননি।

এই প্রসঙ্গে শ্রীম'র ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গান গাইতেন যার প্রথম দুটি কলি এই রকম :

'পাড়ার লোকে গোল করে, বলে আমায় গৌরকলঙ্কিনী।
একি কইবার কথা, কইব কোথা, লাজে মরি ও প্রাণসজনী।'

উদ্ধৃত অংশের দ্বিতীয় কলিতে "কইবার" শব্দটিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব উচ্চারণ করতেন "কয়বার"। শ্রীম যখন পরবর্তীকালে গানটি গাইতেন, তখন শব্দটিকে শুদ্ধ করবার চেষ্টা না করে তিনি অবিকল রামকৃষ্ণদেবের উচ্চারণ অনুসরণ করতেন। একবার ওই গানের পর শ্রীম'র এক অনুরাগী ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "কয়বার" শব্দটি ভুল কি না। শ্রীম বলেন : "হ্যাঁ। তোমরা শুদ্ধ করে গাও। আমাদের His Master's Voice (গুরুবাণী)।" [স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, "শ্রীম দর্শন", দ্বিতীয় খণ্ড (জেনারেল প্রিন্টারস অ্যাণ্ড পাবলিসার্স), পৃঃ ২২২] অর্থাৎ শ্রীম বলতে চাইছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উচ্চারিত শব্দকে শুদ্ধ করবার অধিকার তাঁর নেই। অন্যরা করতে চান, করুন। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন লোকলজ্জার ঊর্ধ্বে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন্ কথা কার মনঃপূত হবে কি হবে না, এ-চিন্তা শ্রীম করেননি। করলে হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে সমকালের কারও কারও বিরূপতা অথবা উদাসীনতা এড়ানো যেত। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। ফলকথা, এই যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে কল্পিত সংলাপ আরোপ করবেন, এটা কোনও মতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়, বিশ্বাস্যও না।

২০.৭. ১৯৭৭

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা-২৯।

শিল্পভাবনা

'কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়'

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

থিয়েটারের শিল্পের দিক, সমাজতত্ত্বের দিক নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে, থিয়েটারের মঞ্চের আড়ালে কুশীলবদের মানসিক পটভূমি, প্রস্তুতি ও নানারকমের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ততটা আলোচনা হয়নি। অথচ শিল্পগত বা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কোন প্রয়োজনা, কোন নাট্যশিল্পীর বিবর্তন কিংবা কোন নাট্যগোষ্ঠীর ইতিহাসও সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। এ নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়াও অস্বস্তিকর হতে পারে, নাট্যকর্মীদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা সামাজিক-তার নীতি লঙ্ঘন করতে পারে। তবুও যদি কিছু নাট্যকর্মীও তাঁদের নিজেদের বিবেচনায় যতটা ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশ সহনীয় বলে মানেন, ততটুকুই লিখে ফেলেন, তাহলে তারই ভিত্তিতে কিছুটা আলোচনা সম্ভব।

কলকাতায় হিন্দী থিয়েটারের বিশিষ্টা অভিনেত্রী, নাট্য-পরিচালিকা ও নাট্যানুবাদিকা ড. প্রতিভা অগ্রবাল সম্প্রতি তাঁর এক ব্যক্তিগত রচনা আমাকে পড়ে শোনান। এই অপ্রকাশিত রচনাটির অংশবিশেষ যথেচ্ছ ব্যবহারের সহৃদয় অনুমতি দিয়ে তিনি আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এই রচনার খানিকটা আমি এখানে হিন্দী থেকে অনুবাদ করে দিচ্ছি। অনুবাদান্তে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলব।

২

'আজ কুড়ি-পঁচিশ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও ছোটবেলার অনেক ছোট-বড় ঘটনা ও সেই সময়ের বাতাবরণ যখন মনকে তীব্রভাবে আলোড়িত করে তখন মনে হয়, অতীতের দিনগুলো যে সুতোয় বাঁধা তা এমনই শক্তপোক্ত যে সময়ের প্রবাহে তা জীর্ণ হয় না, দুর্বল হয় না, বরং অতীত ও বর্তমানকে আরো শক্ত করে বাঁধে।

কখনও কখনও তো এমনও মনে হয় যে দড়ি যত পুরোনো হয় তার গিঁটগুলো যেমন ততই আরো শক্ত হয়ে বসে, ঠিক তেমনিই দিনের পর দিন বছরের পর বছরের পরতের পর পরতের নিচে অবরুদ্ধ অতীত আরো শক্ত বন্ধনে জীবনের সঙ্গে আশ্লিষ্ট হয়। সাহিত্য, সংগীত ও অভিনয়ের প্রতি আমার বর্তমান অনুরাগের বীজ ঠিক কখন জানি না, কিন্তু খুব ছোটবেলায় উপ্ত হয়ে আমার সংস্কারের গভীরে স্থান করে নিয়েছিল, বাইরের চেষ্টা ও পরিবেশ কেবলমাত্র ঐ সংস্কারে প্রোথিত অনুভবকে অনুকূল পরিপোষক তত্ত্বজ্ঞানে পুষ্ট করেছে। এই প্রসঙ্গে বারবার আমার স্বর্গীয় পিতা বালকৃষ্ণ দাসের মূর্তি আমার সামনে ফুটে ওঠে, তাঁর দীর্ঘ সুগঠিত শরীর, ভারী কণ্ঠস্বর, গভীর ভাবপূর্ণ চোখের দৃষ্টি। ছোট বড় সকলেই তাঁকে ভয় পেত, আমিও পেতাম, তবে অন্য ভাইবোনের চেয়ে কম, অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর কাছে অনেক বাড়াবাড়ি করেছি। এর কারণ এখন আর স্পষ্ট খুঁজে পাই না, তবে বোধ হয় সবার চেয়ে ছোট বলেই তাঁর এত কাছে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৪০ সালে আমার বয়স যখন দশ বছর, মা মারা গেলেন। বাড়িতে সংসারের দায় বইতে রইলেন কেবল বৃদ্ধা ঠাকুমা। ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়া সাঙ্গ করেই আমায় স্কুল ছাড়তে হল। বাড়ির ছোটবড় নানারকম কাজের সূত্রে আমি সবসময়ই বাবার কাছে থাকতাম। আমার এখনও মনে আছে, শীতের দিনে বেলা বারোটা-সাড়ে বারোটায় দুপুরের খাওয়া সেরে ছাদে রৌদ্রে বসে, আমি কাজ সেরে পৌঁছলেই বলতেন, 'সেতারটা একটু নিয়ে এস', নয়তো 'গান-বাজনা কিছু হবে না?' ভোরবেলা থেকে কাজ শুরু হয়েছে, তারপর ঐ ভর দুপুরে গানবাজনার মেজাজ আমার একেবারেই আসত না, মনে মনে গজরাতাম, কিন্তু দু'তিনবার ঐ স্বরে বড় স্নেহে যখন আবার ঐ অনুরোধ করতেন, বিরক্তিভরেই উঠে গিয়ে সেতার বা হারমোনিয়ম নিয়ে এসে বসতাম, বাবাও ডুগিতবলা নিয়ে বসে যেতেন। তারপর আধঘণ্টা কি এক ঘণ্টা ধরে টুংটাং চলত, রাগের আলাপ চলত। দিনে ঐ একবারই আমরা দুজন কাজ থেকে মুক্ত হয়ে একটু নিশ্চিন্তে বসবার সুযোগ পেতাম। আজ মনে হয়, বাবা যদি ঐ সময়টুকু আমাকে জোর করে নিজের কাছে না বসাতেন, আমি তো ঐ সময় কিছুই করবার সুযোগ পেতাম না, কিছুই শেখা হ'ত না আমার, বড় হয়ে শুরু থেকে আরম্ভ করে কত দূর এগোতে পারতাম বলা যায় না।

'সাহিত্যানুরাগের সূচনা আরো এক পর্ব আগে থেকেই। পিতামহ স্বর্গীয় রাধাকৃষ্ণ দাসের হিন্দী সাহিত্যসেবার আলোচনা ছোটবেলা থেকেই শুনেছি।

ঠাকুমা গল্প করতেন, ঠাকুরদা রাতদিন কাজে ডুবে থাকতেন, তাঁর ঘর বইয়ে ভর্তি, সেই ঘরে বসেই রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত তিনি লেখাপড়া করতেন। বাবা নিজে সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন কীর্তিমান হননি, কিন্তু তাঁর বাবার সংস্কার তাঁর ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল, এবং তাঁর কাছে থেকেই আমরা ভাইবোনেরা তার অংশ পেয়েছি।

'বাবা রোজই কোন না কোন স্কুল বা সংস্থার নাটাপ্রযোজনার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। নাটকের মহলা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দায়ে বাবা না খেয়ে দেয়ে বেলা দুটো পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন, আবার রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত প্রায়ই জড়িয়ে থাকতেন। ঠাকুমা ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করতেন, "মেয়ের বিয়ের পালা মিটবে কবে?" অর্থাৎ এ ব্যস্ততা কবে শেষ হবে? কখনও কখনও প্রশ্নটা আরো বাঁকালো হয়ে উঠত, "নিজের ছেলেমেয়েগুলোর জন্য কোনদিন কুটোটি নাড়েনি, তাঁরা বাঁচল কি মরল খোঁজ নেই, কিন্তু ঐ নাটকে দিবারাত্র প্রাণ সঁপে দিয়ে বসে আছে।" কখনও আবার, "এ তো তোমার বংশগত পেশা। তোমার বাবা ঐ করতেন, তুমিও তাই করবে, এতে আবার আশ্চর্য হবার কী আছে?" কিন্তু তবু এইসবের প্রতি মনের টান এমন জবরদস্ত, এর আকর্ষণ এমন প্রবল যে একবার সেই আকর্ষণে পড়লে লক্ষ চেষ্টাতেও ছাড়ান নেই। বাবা কিংবা আমি, ঠাকুমা কিংবা স্বামীর সুখ কিংবা বিরক্তি বিবেচনা করে আমাদের জীবনধারা থেকে চাইলেও সরে আসতে পারতাম না। তাই নাটকে জুটে গিয়ে কাটছাঁট করে নাটক তৈরী করা, অভিনেতা বেছে নেওয়া, সাজপোশাক ঠিক করা (এই সাজপোশাক প্রায় সবসময়ই বাড়িতেই থাকত, তার দেখাশোনার দায়িত্বও নিজেই পালন করতেন), মঞ্চ ও পর্দার ব্যবস্থা, মহলা থেকে শুরু করে সব প্রয়োজনেই একাধারে পীর ও বাবর্চি হয়ে বাবার যে ব্যস্ততা তা থেকে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হতেন না, আমিও বিচ্যুত হতে পারি না।

'স্কুলের বার্ষিকোৎসবের নাটকে ভূমিকা গ্রহণের কথা বাদ দিলে ১৯৪৩-৪৪ সালে কাশীর মহিলা সংঘের বার্ষিকোৎসবে আমি প্রথম মঞ্চে উঠি। ঠাকুরদা বাবু রাধাকৃষ্ণ দাসের 'মহারাণা প্রতাপ' নাটকের অংশবিশেষ অভিনীত হচ্ছিল। আর কী কী অনুষ্ঠান ছিল, আজ আর মনে নেই। মহারাণা প্রতাপের ভূমিকাতেই অভিনয় করার সৌভাগ্য হয়েছিল, সে অভিনয় অন্য কারণে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তখনকার পরিবেশে কাশীর অগ্রবাল সমাজের তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের এক কিশোরী আরেক কিশোরীর কাঁধে হাত রেখে

'প্রিয়ে' বলে সম্বোধন করবে, এর চেয়ে বড় নির্লজ্জতা আর কি হতে পারে? এ ধরনের আলোচনা অনেক শুনেছি, কিন্তু সেই প্রথম বলেই এখনও গুরুত্বপূর্ণ। তারপর আবার অভিনয় করার সুযোগ পাই ১৯৪৬ সালে শান্তিনিকেতনে। ম্যাট্রিক পাশ করে ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। হিন্দীভবনের ছাত্রছাত্রীরা কোন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হিন্দী একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হিন্দী বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী প্রেমচন্দের সুপ্রসিদ্ধ কাহিনী 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'র নাট্যরূপান্তর করে প্রযোজনার সিদ্ধান্ত করেন। একদিন দ্বিবেদীজী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "শরীরের গঠনে এবং আকারে হিন্দী ভবনে এমন কোন ছাত্র নেই যে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের ভূমিকা নিতে পারে। তাই ঐ ভূমিকা তোমাকেই করতে হবে।" শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। যেখানে পুরুষেরাই পুরুষদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, মেয়েরা মেয়েদের ভূমিকায়, সেখানে এক পুরুষ ভূমিকায় অভিনয় করতে যাওয়ার প্রস্তাব অদ্ভুত লাগে। ব্যর্থ হব, এ ভয়ও ছিল। কিন্তু তাঁর আশ্বাস ও আদেশের সামনে আমাকে সবই মেনে নিতে হয়। পুরুষের বেশভূষা ও মেকআপ নিয়ে আমি মঞ্চে প্রবেশ করি, নাটক হয়ে গেল, শুনলাম ভালো হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, হস্টেলে ফিরতেই মেয়েরা ঘিরে ধরে আমায় বলতে থাকে, পর্দা উঠতেই ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিল, হিন্দী ভবনে এমন কোমল সুন্দর ছেলে আবার কে এল (যদিও আমি তখন বেশ মোটা ছিলাম, পুরুষের রূপে আসলে নারী হওয়ায় আমাকে কোমল ও সুন্দর মনে হয়েছিল), ওয়াজিদ আলী শাহ হয়ে বসে আছে। কিন্তু আমার প্রথম সংলাপ উচ্চারণেই নারীকণ্ঠ ধরা পড়ায় ওদের স্বল্পক্ষণের ঔৎসুক্য তথা কৌতূহলের অবসান ঘটে। এখনও দ্বিবেদীজীর সঙ্গে দেখা হলেই উনি 'বলুন নবাব সাহেব' বলে সম্বোধন করেন।

'তারপর আবার দু' তিন বছরের ব্যবধান পড়ে। কলকাতায় (বিবাহের পরই কলকাতায় এসে পড়ি) প্রথম মঞ্চাভিনয় একেবারেই ভিন্ন পরিস্থিতিতে। সেই অভিজ্ঞতা যে শুধু আমার ক্ষেত্রেই নতুন তা নয়, বরং আমাদের সব শিল্পী ও সব দর্শকের কাছেও নতুন। ১৯৪৮ এর ৩০ অগস্ট মারওয়াড়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ছোট প্রেক্ষাগৃহে ছোট এক অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে অভিনব সংস্কৃতি পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আমরা দুটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করি—'দো অতিথি' এবং 'কলা ঔর জীবন'। এই দুটি নাটকেই কলকাতার হিন্দীভাষী সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ প্রথম সম্মিলিত অভিনয় করেন। সম্ভবত এই প্রথম ঐ শ্রেণীর লোকেরা

নাটক প্রযোজনা করলেন। অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে সমাজসংস্কারে আগ্রহী অনেকে ছিলেন, তাঁরা আমাদের উৎসাহ দেন ; কিন্তু এক শ্রেণী ছিলেন যাঁরা এই ধরনের প্রয়াসের বিরুদ্ধে সমালোচনা চালিয়ে যান। এঁদের সমালোচনা থেকে বাঁচবার জন্যই আমরা স্থির করি—স্বামীস্ত্রীই কেবল প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামীস্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। নাট্যবিচারে এই প্রযোজনা খুবই অপরিণীত ছিল, তবুও কলকাতায় হিন্দী অব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই প্রযোজনা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তাতে সন্দেহ নেই।'

এই প্রযোজনায় কলকাতায় অব্যবসায়িক হিন্দী থিয়েটারের যে ধারার সূচনা হয়, ১৯৫৫ সালের ২২ ডিসেম্বর 'অনামিকা'-র প্রতিষ্ঠায় তার স্থায়ী সত্তা লাভ ঘটে। শ্রীমতী অগ্রবাল প্রথম থেকেই 'অনামিকা'র অন্যতম পুরোধা। ব্যক্তি-জীবন ও থিয়েটারের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঘটনার বিবরণ তাঁর এই রচনায় আমাকে আকৃষ্ট করে।

"নয়ে হাথ" নাটকটি ১৯৫৭ সালে প্রথম কলকাতায় মঞ্চস্থ হয়। নাটকের অনেক দুর্বলতা ও কাহিনীর চলচ্চিত্রানুরূপ বিন্যাস সত্ত্বেও নির্দেশনা ও টীমওয়ার্কের গুণে এই প্রযোজনা সর্বশ্রেণীর দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। তাই ১৯৫৯ সালে সংগীত নাটক অকাদেমি হিন্দী-নাট্য-প্রস্তুতিকরণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে আমরা "নয়ে হাথ" প্রযোজনার সিদ্ধান্ত করি। ১৯৫৯ সালের ৫ মে দিল্লীতে আমরা সুযোগ্য নাট্যপ্রেমিক, নাট্যসমালোচক ও লেখকদের উপস্থিতিতে এই নাটক পরিবেশন করি। অনামিকা-র এই প্রযোজনা বিচারকমণ্ডলী দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষিত হয়। অনামিকা এইভাবে অখিল ভারতীয় ক্ষেত্রে সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হয়। এই পুরস্কৃত প্রযোজনা কলকাতার দর্শকদের কাছে ২৬ জুলাই ও তারপর আবার দিল্লীতে পুরস্কার বিতরণী উৎসব উপলক্ষে ১৯ অগস্ট পরিবেশনের সুযোগ পাই। নাটক নিয়ে পুরোদমেই কাজ চলছিল, এমন সময় ৯ জুলাই আমি খবর পেলাম, কাশীতে বাবার লিভার ক্যানসার হয়েছে। আমাকে অবিলম্বে কাশী চলে যেতে হল। একে ক্যানসার, তায় লিভারের, তার তো আর কোন চিকিৎসা নেই। বাবার কাছে আমার থাকা আবশ্যক—১৯৪৯ সালে আমার দুই ভায়ের অকালমৃত্যু বাবা ও বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে একাকীত্বে অভিশপ্ত করে রেখে যায়। ঠাকুরমাও ১৯৫৮ সালে মারা যান। বাবার আপনজন বলতে তখন কেবল আমার পিসিমা, আমার বড় বোন আর আমি, এই তিনজন। বাবার ভায়ী ও নাতিরাও ছিল, কিন্তু বোন ও মেয়েরা বাবার

যত আপন ছিল, তত আর কেউ নয়। বাবার যথোচিত চিকিৎসা এবং আসন্ন মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক, আর্থিক এবং ব্যবসায়িক যাবতীয় ব্যবস্থার ভার আমারই উপর পড়ল। একদিকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতা, অন্যদিকে অনামিকার ২৬ জুলাই ও ১৯ অগস্টের শো। দুটিই প্রেস্টিজ শো, আমরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়ই পরিবেশন করতে চেয়েছিলাম। সামনে জটিল সমস্যা—আমি কাশীতে বসে চিন্তা করে যাচ্ছি, আর বাকি সবাই কলকাতায়। ২৬ জুলাইয়ের জন্য পাঁচ দিনে শ্রীমতী ঊষা শাহকে "নয়ে হাথ"-এর ঠাকুরাইনের ভূমিকায় (যে-ভূমিকাটি আমি করতাম) তৈরি করে নেওয়া হল—শেষ পর্যন্ত কথা ছিল, আমি যদি পৌঁছে যাই ভূমিকাটি আমিই করব, নয়তো ঊষা দেবী। আমি ভয়ে ভয়ে বাবার কাছে প্রস্তাব রাখি, শুক্রবার রাত্রে কাশী থেকে কলকাতা রওনা হব, রবিবার সকালে নাটক করে সন্ধ্যার গাড়িতে উঠব, সোমবার কাশী পৌঁছে যাব। বাবার সেই কথাগুলো, তাঁর সেই স্বর আজও সেইভাবেই কানে বাজে—'যাও, যা তোমার ইচ্ছে হয়। এই অনামিকাই তো সবসময় মাথার উপর ভর করে রয়েছে।' বাবার তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি কলেজ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কাশীতে যাই নি, দিল্লী হয়ে আট-দশ দিন বাদে কাশী এসেছিলাম। 'সব সময়' কথাটার মধ্যে সেই অভিমানের ইংগিত ছিল। যিনি নিজে নাটকের জন্য সমর্পিতপ্রাণ, আমি যা-ই কিছু করি, তাতেই যাঁর গভীর আনন্দ হ'ত, যিনি একের পর এক আঘাত অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে হৃদয় পাথর করে সহ্য করেছেন (১৭ দিনের মধ্যে দুই যুবক সন্তানকে আগুনে সমর্পণ করার মর্মান্তিক দায় তাঁকে পালন করতে হয়েছিল), তাঁর এই উক্তির পিছনে কী ছিল, তা বুঝতে আমার এতটুকু সময় লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গেই ওঁকে আরও কষ্ট দেব ভাবতেই অসহ্য লাগে। আমি তার পাঠিয়ে দিলাম—আসা অসম্ভব। ঊষা দেবীই কলকাতায় অভিনয় করলেন।...এবার সমস্যা দিল্লী যাওয়া নিয়ে। বাবার অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। ঈশ্বরের কৃপায় অবশ্য ক্যানসারের ব্যথার কষ্ট তাঁর ছিল না। কিন্তু যাদের সঙ্গেই দেখা হ'ত, তাঁরাই ক্যানসার রোগীর পীড়ার যে হৃদয়-বিদারক চিত্র উপস্থিত করতেন, তাতে আমি ভয় পেতাম আর মনে মনে ভাবতাম, ঐ কষ্ট আরম্ভের আগেই যেন ভগবান ওঁকে মুক্তি দেন। ওঁর সুস্থ হয়ে ওঠা অসম্ভব এবং মৃত্যু অনিবার্য জেনেই মনে হ'ত মৃত্যু ওঁকে কষ্ট থেকে (যে কষ্ট তখনও ছিল, ভবিষ্যতে আরো বাড়বারই সম্ভাবনা) মুক্তি দিক। এখনও ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আমি কি করে লিখতে পারলাম, বাবা যদি ১৭ তারিখের আগে

মারা যান, আমি নিশ্চয়ই দিল্লী যাব, অন্যথায় ঊষা দেবী যাবেন। কিন্তু একথাও আমি বলব, এই উদাসীনতা এবং সামনে যাই আসুক তাকে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি বাবার কাছেই শিখেছিলাম। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। আমার দুই ভাইয়ের মৃত্যুর ২০-২৫ দিন পরের কথা। একদিন দুপুরে হঠাৎ বেসান্ট থিওসফিকাল স্কুলের (হিন্দু স্কুলও হতে পারে) দুই অধ্যাপিকা এসে উপস্থিত। বিদ্যালয়ের বার্ষিকোৎসবে ওঁরা যে নাটক করবেন, তার বেশভূষা সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন, প্রয়োজনমত কিছু সাজপোশাক নিয়ে যেতে চান। আমাদের বাড়িতে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তার খবর তাঁরা জানতেন না। অত্যন্ত শান্ত স্থির চিত্তে বাবা সব কথা শুনলেন, পরামর্শ দিলেন; কিন্তু অধ্যাপিকারা যখন তাঁকে মহলায় এসে কিছু পরামর্শ দেবার প্রস্তাব করলেন, তখন আর তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ওঁর চোখে জল এসে গেল। কারণ জেনে অধ্যাপিকারা অস্বস্তিতে পড়লেন। অত্যন্ত লজ্জায় পড়ে তাঁরা বলেন, তাঁরা বড় অন্যায় করে ফেলেছেন, তাঁদের যেন তিনি ক্ষমা করেন। ক্ষণিক আবেগ আবার শান্ত হয়ে আসে, বাবার আবার সেই শান্ত, স্থির, সংযত ভাব। বাবা বলেন, 'কিছু এসে যাবে না। দু-চার দিনের মধ্যে আপনারা এসে যা চাই নিয়ে যাবেন। আমারই দুঃখ হচ্ছে, আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।' বাবার চরিত্রবলের এই অনুপম দৃষ্টান্ত জ্ঞানে-অজ্ঞানে নানা পরিস্থিতিতে দিঙ্‌নির্ণায়ক হয়, প্রেরণা দেয়। সেই দৃষ্টান্তের শক্তিতেই আজ আমি নিজের বাবা সম্পর্কে এমনি নির্বিকারভাবে লিখতে পারছি, তাতে কোন দ্বিধা বা অন্যায়ের বোধ আসছে না। বিধির বিধান যখন মেনে নিতেই হয়, তখন সাহসের সঙ্গে মেনে নেব না কেন? ১২ অগস্ট রাত দশটায় বাবার ইহলীলা সমাপ্ত হয়। ১৩ই সকালে আমি চিঠি লিখে দিলাম, ১৭ তারিখে দিল্লীগামী দলের সঙ্গে আমি মোগলসরাইয়ে যোগ দেব। আমি দিল্লী গেলাম, ১৯শে নাটকে অভিনয় করলাম, ২০ তারিখ সকালে ট্রেনে উঠে রাত এগারোটায় কাশীতে পৌঁছলাম, ২১ তারিখ সকালে দশকর্ম বিধান ছিল। এই সব কিছু আজ ভাবতে বসলে বড় জটিল লাগে। অনেক বার নিজেরই মনে সংশয় এসেছে—আমার এই আচরণে কি আমার হৃদয়হীনতাই প্রমাণিত হল? কখনও বা মনে হয়েছে, যে শুনবে সেই তো ভাববে, বাবা মারা যাবার পাঁচ দিনের মধ্যেই মেয়ে কি করে নাটক করতে গেল? বিশেষ করে সেই মেয়ে যে বাবার এত আপন ছিল? জানি না কে কী ভেবেছিল, তবে খুব একটা প্রতিকূল সমালোচনা হয়নি। তবে হ্যাঁ,

আমার এই জ্ঞান হয়, অত্যন্ত সংকটজনক বহু পরিস্থিতিতেই আমি একটু সংযম ও বিবেচনায় কাজ সামলে নিতে পারি। উপরোক্ত ঘটনার বিবরণে যদি কেউ আত্ম-প্রশংসার গন্ধ পান, তবে তাঁর কাছে আমি আমার প্রকাশভঙ্গির অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, কারণ এই ঘটনার স্মৃতিচারণায় আমি কেবল এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে চেয়েছি, আর হয়ত এমনি একটা ইচ্ছাও ছিল যে এই ধরনের অভিজ্ঞতায় পড়লে কেউ যদি দৃঢ় ও স্থবিবেচক থাকবার প্রেরণা পান।'

৩

এক ধরনের ভূমিকায় শ্রীমতী অগ্রবাল কলকাতার শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীদের অন্যতমা। 'মেরে বচ্‌চে', 'আধে অধুরে' ও 'গোদান' নাটকে তিনি মুগ্ধ করেন সেই মায়ের ভূমিকায় যিনি আঘাত সহ্য করতে জানেন, অন্যদের আঘাত থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করেন, নিজের বেদনাকে ঢাকেন কঠিন অথচ স্বচ্ছ আত্মসংযমের বর্মে। অথচ তাঁকেই অবাস্তব লাগে সোসাইটি নারীর অভিনয়ে। হয়ত তাই স্বাভাবিক। তাঁর আত্মকথনে যে প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাতে উত্তরভারতীয় সংস্কারে আবিষ্ট পরিবেশ থেকে স্বাতন্ত্র্যাভিমানের উত্তরণ বোঝা যায়। সেই পরিবেশের জননীমূর্তি শিক্ষিত আধুনিক বিচারে যে মর্যাদায় মণ্ডিত তা-ই শ্রীমতী অগ্রবালের চরিত্রচিত্রণের ভিত্তি। তার বাইরে মূলহীন শৌখিনতার চিত্রণে যে হালকা আঙ্গিকতার প্রয়োজন তা তিনি ধরতে পারেন না। এটা নিশ্চয়ই অভিনেত্রীর পক্ষে সীমাবদ্ধতার কথা। শাঁওলী মিত্র 'যদি আর একবার' নাটকে অবলীলায় যা আনতে পারেন, শ্রীমতী অগ্রবাল তা পারেন না কেন? মায়া ঘোষ 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে যে আদিম শারীরতায় বিস্ময় সৃষ্টি করেন, তিনিও কিন্তু 'রাজরক্ত' নাটকে অসত্য থেকে যান। আসলে অভিজ্ঞতা অভিনেত্রীকে সে মাটি দেয়, সে-মাটিতে সব বীজ ফলন্ত হয় না। অভিজ্ঞতার সীমা কল্পনায় বিস্তৃত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিতের সঙ্গে তার শিকড়ের যোগ থাকে। সেই শিকড় ছেড়ে উড়তে গেলে পতন অনিবার্য। এই সীমাবদ্ধতা অপেশাদার থিয়েটারেরই সীমাবদ্ধতা। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা আধুনিকমনস্ক বুদ্ধিবাদী থিয়েটারের সম্পদ।

পেশাদার থিয়েটারের শিক্ষাই বৈচিত্র্যের শিক্ষা, আঙ্গিক ও বাচিক কলাকৌশলের শিক্ষা। মুখ, বচন ও শরীরকে, কখনও কখনও স্বর ও স্বরকেও প্রবল নমনীয় ও বিচিত্রকারী করে তোলার শিক্ষাই পেশাদার অভিনয়শিল্পীকে তৈরি করে। বিনোদিনীর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায়, এই শিক্ষা শিল্পীকে কত-

দূর নিয়ে যেতে পারে। পেশী থেকে স্নায়ুতে আবেগ ঝঙ্কার করে বিনোদিনী তাঁর অভিনয়কে প্রবল করেছেন। কিন্তু পেশাদার শিক্ষায় ও অপেশাদার বুদ্ধিজারিত আন্তরিকতায় জটিলতর আধুনিক চরিত্রচিত্রণে কতটা প্রভেদ আসবে, তার তুলনার সুযোগ আমি অন্তত কোথায়ও পাইনি। একই ধরনের জটিল আধুনিক ভূমিকায় পেশাদার ও অপেশাদার দুজন সমান সার্থক শিল্পীর অভিনয় দেখার সুযোগ পেলে এই তুলনা হয়ত সম্ভব হ'ত। নান্দীকারের 'নটী বিনোদিনী' ও রঙ্গনার 'নট নটী', দুটি নাটকই মোটামুটি একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করেছে, পেশাদার ব্যবসায়িক থিয়েটারের নাট্যবিন্যাসের নিয়মে। বিনোদিনীর মানসিক জীবন বলতে রামকৃষ্ণময় ভক্তিবাদের উচ্ছ্বাস ছাড়া নাট্যকাররা আর কিছুই খুঁজে পাননি। অথচ বিনোদিনীর আত্মকথার মধ্যেই সমাজ-সংসার ও অভিনেত্রীজীবনের বিরোধের যে বিস্তারিত প্রকাশ, তাকে কাজে লাগিয়ে যদি একটা সত্যিকারের আধুনিক নাটক লেখা হ'ত, তবে হয়ত কেয়া চক্রবর্তী ও মঞ্জু ভট্টাচার্যের সঙ্গে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনার সুযোগ পাওয়া যেত। ব্যবসায়িক থিয়েটারের স্টিরিওটাইপের সীমার মধ্যে বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়ের পেশাদার স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈচিত্র্য কেয়া চক্রবর্তী ও মঞ্জু ভট্টাচার্যের জোরজারির পাশে অনেক বেশি সম্পন্ন।

পেশাদার শিল্পীদের অভিনয়ের সার্থকতায় আমরা যতই মুগ্ধ হই, অন্তত ভাবতে ভালো লাগে, আধুনিক চিন্তা ও জীবনবিচারে নিশ্চয়ই এমন অনেক প্রদেশ আছে যা পেশাদার কলাকৌশলের আয়ত্ত নয়। 'আধে অধুরে' নাটকে প্রতিভা অগ্রবালের অভিনয়ের পর শৌভনিক প্রযোজনার পেশাদার অভিনেত্রীর অভিনয় কৃত্রিম ও কৌশলনির্ভর লেগেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীরমাঝি'-র প্রযোজনায় দুই পেশাদার অভিনেত্রীই মানিকবাবুর মালা ও কপিলা চরিত্র দুটিকে যথাক্রমে ছিঁচ-কাঁদুনেপনা ও লাস্যময়ী ছেনালিপনায় টেনে নামিয়েছেন। কিন্তু কেমন করে বলব এই ব্যর্থতা পেশাদার অভিনেত্রীদেরই ব্যর্থতা, না বিশেষ দুই অভিনেত্রীর ব্যর্থতা?

একটা কথা অবশ্য বলে নেওয়া ভালো। বিলিতী উপমান এক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য এই কারণে যে আমাদের দেশে পেশাদার অভিনেত্রী বলে সাধারণত তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা সহজাত অভিনয় ক্ষমতার জোরে কেবলমাত্র অভিনয় করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। অভিনেত্রী এখনও বাংলাদেশে সামাজিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ নন। বছর তিনেক আগেও দেখেছি, এক বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় স্বামীর পক্ষ স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এই কারণে যে, ভদ্রমহিলা বহুরূপীর 'রাজা' নাটকে একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। মামলায়

ভয়ংকর দলিল হিসেবে পেশ করা হয়, বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় ঐ প্রযোজনার সপ্রশংস সমালোচনা, তাতে ঐ ভদ্রমহিলার গান সম্পর্কে দু'চারটি ভালো কথা। তথাকথিত সম্ভ্রান্ত বাঙালী ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজে এই ধরনের অশিক্ষিত মনোভাব পেশাদার অভিনেত্রীদের শ্রেণীতে আরো শিক্ষিতা, সচেতন, শিল্পবোধে লালিতা অভিনেত্রীদের প্রবেশে প্রতিবন্ধক।

একদিকে পেশাদার অভিনেত্রীদের যত্ন ও নিষ্ঠার তুলনারহিত দৃষ্টান্ত অন্যদিকে অপেশাদার অভিনেত্রীদের অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন (যার চমৎকার দৃষ্টান্ত শ্রীমতী অগ্রবালের পূর্বোদ্ধৃত নিবন্ধ) ও শিক্ষার দান যে জীবনবোধ অভিনয়ে প্রতিফলিত, এই দুইয়ের উপর ভর করে যদি থিয়েটারের দুটি ধারা নিজেদের আরো স্বতন্ত্র করে, তবে হয়ত এই দুয়েরই বৈশিষ্ট্যে আমরা মুগ্ধ হব। তখন হয়ত আর 'বারবধূ'র পুরনো নাটকবিন্যাসে কেতকী দত্তের ব্যক্তিত্বের ঋজুতা ও গভীরতার পাশে অসীম চক্রবর্তীর অক্ষম মাতলামি দেখে মৃত্যুপথযাত্রী জনৈকের ভূমিকায় অসীমের অভিনয়ের স্মৃতি টেনে এনে কষ্ট পেতে হবে না, মমতা চট্টোপাধ্যায়, ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ ও শেলি পালের মত অভিনেত্রীদের এক অদ্ভুত মধ্যবর্তী প্রদেশে বিচরণ করতে হবে না। অপেশাদার থিয়েটারের মধ্যেও পেশাদার অভিনয়শিক্ষার একটা ধারা প্রবেশ করা উচিত। তাতে পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই শিক্ষাদানে পেশাদার ভিত্তিতে নিয়োগ করা উচিত, তবেই আঙ্গিক কলাকৌশলের সেই সম্পদ ব্যবহার্য উপকরণরূপে অপেশাদার থিয়েটারের আয়ত্ত হবে। অপেশাদার থিয়েটারে অভিনয়ের সাধারণ মান যে কী শোচনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পেশাদার ব্যবসায়িক থিয়েটারের দুর্বলতায় তা এতদিনে প্রকট হয়নি। কিন্তু এবার ব্যবসায়িক থিয়েটারের পুনরভ্যুদয়ে তা ধরা পড়বেই। বুদ্ধি ও বিচারের জোরে অন্য একটা মাত্রা যোজনার যে স্বাতন্ত্র্যে অপেশাদার থিয়েটার বাঁচতে পারে, তার সুযোগও সীমিত হয়ে আসছে, কারণ অপেশাদার থিয়েটার পেশাদার থিয়েটারের দর্শক আকর্ষণ করতে পেশাদার থিয়েটারেরই উপযুক্ত নাটক ও শৈলী অবলম্বন করেছে। সেই প্রতিদ্বন্দ্বে পেশাদার থিয়েটারের জয় অনিবার্য। চেতনার 'জগন্নাথ', থিয়েটার ইউনিটের 'পন্ত লাহা' ও 'এতটুকু বাসা', থিয়েটার কমিউনের 'দানসাগর' এবং বাদল সরকার ও উৎপল দত্তের প্রযোজনাগুলির গুণাগুণ সম্পর্কে যতই মতবিরোধ হোক, এই কটি ক্ষেত্রে অপেশাদার থিয়েটার তার নিজের স্বাতন্ত্র্যের আত্মাভিমানে পেশাদার থিয়েটারকে চ্যালেনজ্ করেছে, দুই থিয়েটারের ভেদকে চিহ্নিত করেছে। ইদানীন্তকালে এই দৃষ্টান্তগুলি ব্যতিক্রম ও ভরসাস্থল।

অভিধান প্রসঙ্গে

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষাতাত্ত্বিকদের ধারণা, ভাষা সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরে কোন অভিধান সংকলিত হয়নি। ভাষা পরে জটিল ও বিস্তৃত হওয়ার ফলে অভিধানের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। যিশুখ্রীষ্টের জন্মের সাত শতক আগে মেসেপোটামিয়ায় সংকলিত এক অ্যাকাডিয়ান (Akkadian) শব্দ তালিকা এখনও টিঁকে আছে ; অভিধান সংকলনের পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যের জন্ম গ্রীস দেশে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীসে সংকলিত অভিধানের কথা আমরা জানতে পেরেছি। আলেক্সান্দ্রিয়ার প্যাম-ফিলাস-এর লেক্সিকনের পর প্রচুর লেক্সিকন হয়েছে গ্রীস দেশে। দ্বিতীয় শতকে অ্যাটিসিস্টদের (Atticists) সংকলিত অভিধানগুলি বেশ নাম করেছিল। পঞ্চম শতকে আলেক্সান্দ্রিয়ার Hesychius-এর অভিধান এবং মধ্যযুগে Photius ও Suidas-দের অভিধানগুলির কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে।

গ্রীসের অভিধান নয়, লাটিন সুবৃহৎ অভিধানগুলিই ইংরেজি লেক্সিকোগ্রাফিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। যিশুর জন্মের এক শতক আগে মারকাস টেরেনটিয়াস ভারো সংকলিত De lingua Latina অভিধানটিই এই ভাষার প্রাচীনতম অভিধান বলে অনেকে মনে করেন। লাটিন ভাষার শব্দের সঙ্গে আরও অন্যান্য ভাষার বেশ কিছু শব্দ নিয়ে ১৫০২-এ প্রকাশিত হয়েছিল আম-ব্রোজিয়ো ক্যালেপিনোর (Ambrogio Calepino)-র বিশাল অভিধান। এই অভিধান এমন জনপ্রিয় হয়েছিল যে "Calepin"—ক্যালেপিন মানেই বোঝাত অভিধান। ১৫৬৮তে ল্যাঙ্কাশায়ারের এক দলিলে দেখা যায়—I will that Henry Marrecrofte shall have my Calapyne and my parafrasies. উইল করে কাউকে অভিধান দিয়ে যাওয়ার এমন উদাহরণ আর আছে কিনা জানি না। কিন্তু এ এক পুরনো উদাহরণ যার থেকে পরে 'জনসন খুলে দেখুন,' কিংবা 'ওয়েবস্টার দেখুন' কথাগুলি চালু হয়ে যায় বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

এক ভাষার শব্দ ও শব্দার্থ সংকলনে যা সমস্যা তার চেয়েও বেশি সমস্যা ছিল একাধিক ভাষার শব্দ ও শব্দার্থ সংগ্রহে। এক ভাষা থেকে আরেক ভাষার অভিধানও সংকলিত হয়েছিল বেশ আগে। ভ্রমণার্থীদের সুবিধার জন্য ১৪৮০তে

উইলিয়ম ক্যাক্সটনের French-English Vocabulary প্রকাশিত হয়েছিল। এই অভিধান ছাপা হয়েছিল ইংলণ্ডে। প্রখ্যাত বৈয়াকরণ জন স্টানব্রিজের Latin-English Vocabulary প্রকাশিত হয়েছিল ১৪৯৬-এ। এই অভিধানের কাটতি ছিল বেশ ভালো। ঘন ঘন এর পুনর্মুদ্রণ হতো। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ইংরেজী লাটিন অভিধানের নাম Promptorius puerorum। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৪৯৯-এ। পরে এর নাম বদলে গিয়ে হয়—Promtorium parvulorum sire Clericorum। লণ্ডনে ফরাসী ভাষার এক শিক্ষক জন পালসগ্রেভের ইংরেজি-ফরাসী অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৩০-এ। প্রকাশক ও মুদ্রকের সঙ্গে পালসগ্রেভ এমন এক চুক্তি করেছিলেন যাতে তাঁরা নিজের অনুমতি ছাড়া এক খণ্ড অভিধানও বিক্রী হতো না। ফরাসী ভাষা শিখিয়েই তিনি তাঁর সংসার চালাতেন। অভিধান থেকে ভাষা শিখে নিলে তাঁর রুজিরোজগারে টান পড়বে বলেই তিনি এমন ব্যবস্থা করেছিলেন। চুক্তির কারণ সম্বন্ধে তদানীন্তন ইংরেজিতে লেখা হয়েছে—lest his profitt by teaching the French tongue myght be mynished by the sale of the same to suche persons as, besids hym, wern disposed to studye the sayd tongue. ১৫৩৮-এ রাজা অষ্টম হেনরির উৎসাহে স্যার টমাস এলিয়ট করেছিলেন লাটিন-ইংরেজি অভিধান। ১৫৪৭-এ ওয়েলসের মানুষ যাতে দ্রুত ইংরেজি শিখতে পারেন তার জন্য উইলিয়ম সেলসবেরি ওয়েলস-ইংরেজি অভিধান সংকলন করেছিলেন। ১৫৬৫তে টমাস কুপার স্যার টমাস এলিয়টের লাটিন-ইংরেজি অভিধানের উপর নির্ভর করে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত এক অভিধান সংকলন করেন। জন অব্রে কুপার সম্বন্ধে একটি তথ্য জানিয়েছেন তাঁর—'Brief Lives' গ্রন্থে। কুপার খুব রাত জেগে একা একা অভিধানের কাজ করতেন। তাঁর স্ত্রী এই জন্য খুব রাগ করতেন। একদিন তিনি সুযোগ করে কুপারের স্টাডিতে ঢুকে অভিধানের সব কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। অভিধানের কাজ তখন প্রায় অর্ধেক শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুপার এই ঘটনায় এতটুকুও দমে যাননি। তিনি বর্ধিত উৎসাহে কাজে নামেন এবং অভিধানটি শেষ করেন (···that good man had so great a Zeale for the advancement of learning, that he began it again, and went through with it to that perfection that he hath left it to us, a most usefull worke.)

অভিধানের উল্লেখ পাওয়া যায় বোস্টন লিঙ্কনশায়ারের ১৫৭৮-এর একটি পৌর

রেকর্ডে। বলা হয়েছে, পড়ুয়াদের সুবিধার্থে একটি অভিধান কেনা হবে এবং তা শিকল দিয়ে বেঁধে টেবিলে রাখা হবে। যাঁর যখন দরকার তিনি সেটি দেখতে পারবেন।

বানান সংস্কারকগণ ইংরেজি অভিধান সংকলনে উৎসাহী ছিলেন। ১৫৬৯-এ জন হার্ট নামে জনৈক হতাশ সংস্কারক বলেছিলেন, ইংরেজি ভাষায় এত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে যে নিখুঁত অভিধান বা ব্যাকরণ আর প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। অভিধানের প্রতি এবার স্কুল-শিক্ষকগণ আগ্রহ দেখালেন। এডমাণ্ড কুতে (Edmund Coote) নামে একজন শিক্ষক ১৫৯৬-এ বের করলেন একটি অভিধান যাতে Etymology অনুসারে ১৪০০ শব্দের একটি তালিকা ছিল। এই তালিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ইংরেজি অভিধান বলতে যা পরিচিত, আট বছর পরে তা সংকলিত হয়েছিল কুতের তালিকার উপর নির্ভর করেই। ১৬০৪-এ প্রকাশিত প্রথম বিশুদ্ধ ইংরেজি অভিধানের নামটি ছিল বেশ দীর্ঘ—A Table Alphabeticall, conteyning and teaching the true writing and understanding of hard usuall English wordes, borrowed from the Hebrew, Greeke, Latine or French & C. এই অভিধানের সংকলক ছিলেন স্কুল শিক্ষক রবার্ট কউড্রে। তাঁর ছেলে টমাস তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেন। টমাসও ছিলেন স্কুল শিক্ষক। এই অভিধানে ৩০০০ শব্দ ছিল।

য়ুরোপের কয়েকটি দেশের তুলনায় ইংলণ্ডে অভিধানের সংখ্যা কম এরকম একটা অভিযোগ তখন শোনা যাচ্ছিল। ফরাসী ও ইটালীয়ান ভাষার মতো ইংরেজি ভাষাকেও ঠিক করে নেওয়া দরকার—এই আশায় জোসেপ অ্যাডিসন, অ্যামব্রোজ ফিলিপস্, আলেক্সাণ্ডার পোপ প্রমুখ বিখ্যাত লেখকগণ সক্রিয় ও সচেষ্ট হলেন। কিন্তু কাজটা করলেন স্যামুয়েল জনসন। পাঁচটি প্রধান প্রধান প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ১৭৪৬-এর ১৮ জুন এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পরের বছর জনসন ৩৪ পাতার একটি প্রসপেক্টাস বের করেন। ভাষার আলোচনায় তাঁর এই ৩৪ পাতার রচনা আজও অসাধারণ মর্যাদা পেয়ে থাকে। জনসন ছজন সাহায্যকারীকে নিয়ে ৪৩,৫০০ শব্দ সংকলিত করেন। সেই যুগে ইংরেজি ভাষাকে সুনির্দিষ্ট পথে চালনা করার যে দাবি উঠেছিল তার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজ যতই এগিয়ে চলল তিনি দেখলেন ভাষা স্থায়ী, শক্ত কোন বিষয় নয়। ভাষা বহমান। জনসন তখন ভাষার বিকৃতি রোধের প্রতিই নজর দিলেন।

ভাষাকে নিজের মতো করে ব্যবহার করার একটা অত্যুগ্র প্রবণতা সকলের মধ্যেই থাকে। অযোগ্য লোকের হাতে পড়ে ভাষা তখন স্খলিত হয়ে পড়ে। জনসন এদিকে দৃষ্টি দিলেন। জনসনের অভিধানের প্রধান আকর্ষণ ছিল তার ১,১৮,০০০ হাজার উদ্ধৃতি। সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে 'take' verb-এর ১১৩টি প্রয়োগ তিনি দেখিয়েছেন, অকর্মক ক্রিয়া হিসেবে এই ক্রিয়ার তিনি দেখিয়েছেন আরও ২১টি প্রয়োগ। তাঁর আগে এটা আর কেউ পারেন নি। জনসনের জীবদ্দশায় চারটি সংস্করণ বেরিয়েছিল তাঁর অভিধানের।

নোয়া ওয়েবস্টার কুড়িটি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বিষয়ে কাজ করেছিলেন। কিন্তু ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল খুব সীমিত। জার্মান পণ্ডিত জেকব গ্রীম, ফ্রানজ বপ ও রাসমাস রাস্ক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের হাতে অভিধানের নতুন যুগের সূচনা হলো। ১৮১২ তে ফ্রানজ পাসো তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন—এমন কি উদ্ধৃতিগুলিও কালানুক্রমিকভাবে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। প্রতিটি শব্দের ইতিহাস তার দ্বারা দেখানো যাবে। জেকব ও উইলহেলম গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় এই তত্ত্ব মানেন তাঁদের Deutsches Worterbuch অভিধান, ১৮৩৮-এ। এই অভিধানের প্রথম খণ্ড ছাপা হয়েছিল ১৮৫২-য়, দ্বিতীয় খণ্ড বেরুতে হয়ে যায় ১৯৬০। ফরাসী Maximilien-Paul-E´mile Littre´ তাঁর Dictionnaire de la langue francaise এর কাজ শুরু করেন ১৮৪৪ এ। কিন্তু মাঝখানে বিপ্লবের জন্য ১৮৭৩ এর আগে তাঁর কাজ শেষ হয়নি।

ইংরেজি অভিধানে জন জামীসন (John Jamieson)-এর 'Etymological Dictionary of the Scottish Language-এর গুরুত্ব অসাধারণ। তিনি ভাষার ধ্রুপদী বিশুদ্ধতার প্রতি যতটা দৃষ্টি দিয়েছিলেন, ততটাই মনোযোগী ছিলেন গ্রাম্য আঞ্চলিক ও ছোটখাটো উদাহরণগুলির প্রতি। এখন হরেকরকম অভিধান সংকলিত হয়। এক অর্থে, তিনি ছিলেন এইসব অভিধানের জনক। জামীসনের প্রকাশন তালিকা (১৮১৫-১৮৪৮) দেখিয়েছিল অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানের আগে তাঁর সংগ্রহই ছিল বেশী। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধানের প্রয়োজনীয়তা যে বারবার অনুভূত হয়েছিল ইংলণ্ডের শিক্ষিত জনমানসে, তা পূরণ করার ক্ষমতা জামীসনের অভিধানের ছিল না। ১৮৪২-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল The Philological Society। ১৮৫৭-য় Richard chenevix এর দুটি প্রবন্ধ—on some deficiencies in our English dictionaries' অক্সফোর্ডের A New

English Dictionary-র বীজবপন করে। প্রাথমিক কাজ হয় দুজন সম্পাদক হারবারট কোলরিজ, ও ফ্রেডেরিক জেমস ফারনিভালের অধীনে। ১৮৭৯তে ভাষাতত্ত্বে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত জেমস অগস্টাস হেনরি মারে সম্পাদক নিযুক্ত হন। পাঠকরা উদ্ধৃতি পাঠাতে থাকেন। ১৮৯৮-য় Quotation Slip এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,০০০,০০০। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও ১,০০০,০০০টি স্লিপ (ব্যবহৃত হয়েছিল মাত্র ১,৮২৭,৩০৬ টি। মুদ্রকের কাছে ১৮৮২ থেকে কপি যেতে শুরু করে। ১৮৮৪তে সমাপ্ত হয় প্রথম খণ্ড। পরে আরও তিনজন সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতেন। ১৯২৮-এর আগে অভিধানের কাজ শেষ হয়নি। ১৫,৫০০ পাতায় দীর্ঘ তিন কলম জুড়ে বই। কাজ শুরুর পর হাতে যে সব তথ্য এসেছে তা নিয়ে ১৯৩৩-এ বেরিয়েছে সংযোজনী খণ্ড। ঠিক হয়েছে এই প্রামাণ্য অভিধানে কোন সংশোধন হবে না, হবে সংযোজন। New English Dictionary নাম সমীচীন হবে না ভেবে ১৮৯৫-এর পর থেকে The Oxford English Dictionary নামেই এর খ্যাতি।

ভাষার একটি সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি এই অভিধান। কত রকমেরই না অভিধান পাওয়া যায় এখন। খিস্তি খেউড়ের অভিধান থেকে শুরু করে চরিতাভিধান, পৌরাণিক অভিধান, নামের অভিধান, বিভিন্ন পরিভাষার অভিধান, অপরাধ জগতের ভাষাভিধান, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রভৃতি। অভিধানের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ সময়ের সামাজিক আবহাওয়াও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৭৮৫-তে ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস গ্রোজ বের করেছিলেন A classical Dictionary of the Vulgar tongues. এতে অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের তথাকথিত নিচু শ্রেণীর মানুষ ও তাদের সমাজের একটি নির্ভরযোগ্য বাস্তব ছবি পাওয়া যায়।

অক্সফোর্ড অভিধান প্রসঙ্গে Sir William Craigie-র নাম অবশ্য উল্লেখ্য। ১৯২৮-এ প্রাথমিক কাজ শেষ হওয়ার পর প্রভূত উপাদান প্রায় প্রতিদিন সম্পাদকমণ্ডলীর হাতে যাচ্ছে। Sir Craigie-ই সংযোজনী খণ্ডের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি 'A Dictionary of the older Scottish Tongue—1 th to 17th Century' সংকলনের কাজে হাত দেন। ১৯২৫-এ শুরু হয়েছিল কাজ। তিনি মারা গেলে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অসমাপ্ত কাজ হাতে নেবে এরকম একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫৭-য় ওই কাজ এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হাতে তুলে নেন। ১৯৭১-এ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মাত্র

natural শব্দ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় কী নিখুঁতভাবে কাজ করা হচ্ছে।

অভিধানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি এখানে সংকলিত করলাম। ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগের চেয়ে যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাই একটি অভিধানের সংকলন কার্যকে নিখুঁত করতে পারে। আমাদের দেশে সংস্কৃত কোষকারগণ বহু বৎসরব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনায় সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের উপযোগী অভিধান প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু একটি বিদ্যা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় বহু মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ যতটা সহজে হয়, একক প্রচেষ্টায় তা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। রাধাকান্তদেব বাহাদুরের 'শব্দ কল্পদ্রুম' এনসাইক্লোপিডিয়া ও অভিধানের মিলিত রূপ বলা যেতে পারে। তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, ন্যায়, দর্শন, পুরাণ ইতিহাস, সঙ্গীত, শিল্প, জ্যোতিষ, তন্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। তাঁর অভিধান বাচস্পত্যম কিংবা মনিয়ের উইলিয়মসের সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের চেয়ে ভালো। মনিয়ের উইলিয়মস খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহায়তাকল্পে তাঁর সংস্কৃত-ইংরেজি ও ইংরেজি-সংস্কৃত অভিধান দুটি প্রস্তুত করেন। উইলিয়ম কেরী এইজন্যেই তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধান সংকলিত করেন। ম্যাকডোনেলের অভিধানে বেদোত্তর সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সবই কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টার ফল। একক প্রচেষ্টায় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরাট কোষগ্রন্থ সংকলনে প্রভূত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। আর্থিক কষ্টে পড়ে তিনি কলকাতায় কাজ নিয়েছিলেন। কিন্তু অভিধান সংকলনের সঙ্কল্প কখনোই মন থেকে দূর করেন নি। রবীন্দ্রনাথ কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে বলে তাঁর একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাঁকে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং সুষ্ঠু পরিবেশে তাঁকে কাজ করার সুযোগ করে দেন। হরিচরণের কাজে লাগে প্রকৃত ব্যাকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাদেশিক শব্দমালা ও বিদ্যাসাগরকৃত 'শব্দ সংগ্রহ' ইত্যাদি। এছাড়াও প্রাচীন ও নবীন বাঙলা গদ্য-পদ্য পুস্তক, নাটক ইত্যাদি তাঁকে তন্নতন্ন করে খুঁজে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করতে হয়েছিল। রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধান তাঁর 'আদর্শ অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক'। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে আছে সংস্কৃত ও বাঙলা উভয় ভাষারই শব্দ সন্নিবেশ। হরিচরণ তাঁর কোষগ্রন্থে দিয়েছেন :

১. বাঙলা ভাষার আবশ্যক বা উল্লেখযোগ্য সমস্ত শব্দ

২. তদ্ভব বাঙলা শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখানোর জন্য মূল সংস্কৃত ও তা থেকে ক্রমিক পালি, প্রাকৃতের রূপ এবং তদনুযায়ী হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, সিন্ধি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত শব্দরূপ

৩. বাঙলায় প্রচলিত বিদেশী ভাষান্তরের শব্দসমূহের বিশুদ্ধ মূল রূপ

৪. শব্দার্থ সমর্থনের জন্য প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি।

তিনি দেখিয়েছেন :

১. বাঙলায় প্রচলিত সমস্ত সংস্কৃত শব্দের পাণিনি অনুসারে ব্যুৎপত্তি ও সমাস

২. সংস্কৃত ধাতুসমূহের অর্থগণ প্রভৃতি ও ভাষান্তরের ধাতুর সঙ্গে তুলনা করে বাঙলার ধাতুসমূহের অর্থ ও প্রয়োগ

৩. সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত শব্দাবলীর বিচারপূর্বক নির্ণীত শব্দের প্রয়োগ।

সুতরাং হরিচরণের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' একটি উপযোগী সংস্কৃত অভিধানের মর্যাদা পেতে পারে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে শব্দসংখ্যা ৭৫,০০০। হরিচরণের শব্দসংখ্যা, বলা বাহুল্য, এর চেয়ে অনেক বেশি।

এই কোষগ্রন্থ প্রণয়নে তাঁকে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি। তিনি লিখেছেন, "ভূতপূর্ব সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘ আটাশ বৎসর ধরিয়া বাংলা ভাষার একখানি সুবৃহৎ অভিধান সংকলন কার্যে আত্মনিয়োজিত হইয়া আছেন।···দিনের পর দিন অধ্যাপনার কার্য হইতে যেটুকু ছুটি তিনি পাইয়াছেন, অমনিই তাঁহার অভিধানের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। ছোট বড় নানা অভিধানে ভরা একখানি তক্তাপোষ—কেবল বাঙ্গলার নহে, সমস্ত সংস্কৃত অভিধান, এবং পালি প্রাকৃত ফার্সী উর্দু হিন্দী, মারাঠী গুজরাটী উড়িয়া ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার অভিধান। এতদ্‌ভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তক ও সংস্কৃত সাহিত্যের যাবতীয় পুস্তক, তাঁহার অভিধানের উপাদানস্বরূপ নানা আলমারী ও শেল্‌ফে মজুত রহিয়াছে। এই পুস্তকস্তূপের মধ্যে, অক্লান্ত কর্মী, জ্ঞানতপস্বী, দীর্ঘদেহ শীর্ণকায় এই ব্রাহ্মণ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আপন মনে তাঁহার সংকলন-কার্য করিয়া যাইতেছেন।···কেহ আসিলে তাঁহার সহিত আলাপ জমাইবার তাঁহার সময়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই—তাঁহার অমায়িক সরল হাস্যের সহিত কার্যের সঙ্গে সঙ্গেই দুই চারিটী বাক্য বিনিময় করিয়া লইতেছেন।"

একা এই কষ্ট ও মানসিক উদ্বেগ ভোগ করতে কি সকলে পারেন? দীর্ঘ কয়েক বছর একজন মানুষকে একটি কোষগ্রন্থ সংকলনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমানভাবে মনোযোগী থাকতে হয়েছে, সাহিত্য, ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্বের বহু জটিল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর রাখতে হয়েছে। যৌথভাবে এই কাজে সাফল্য লাভ অনেক সহজ। অনেকের একত্রিত মনোযোগের ফলে ভুলভ্রান্তি কম হতে পারে। কোন তথ্য বাদ পড়ল কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই দৃষ্টি বেশ সজাগ থাকে। একটা স্বীকৃত পদ্ধতি ও নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে সকলকে কাজ করতে হয়।

অভিধান সংকলনে কিন্তু কিছু সমস্যা থাকেই। যেমন শব্দের স্বীকৃত অর্থ নথিভুক্ত করতে হয়। প্রায়শই দেখা যায় একাধিক অভিধানে একই শব্দের অর্থ-সাযুজ্য নেই, আবার পুরনো কিছু শব্দের যদি কিছু নতুন অর্থাভাস ও তাৎপর্য থাকে তাও কিছু আগে সংকলিত অভিধানে পাওয়া যায় না। বাঙলা অভিধান থেকে আমি এর উদাহরণ দেবো। দিনকয়েক আগে নিছক কৌতূহলবশতই, শরীরের প্রত্যঙ্গবাচক শব্দ নিয়ে কবিতা রচনায় অভ্যস্ত ও উৎসাহী এক অল্পবয়সী কবির কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম 'জঙ্ঘা' শব্দের মানে। 'জঙ্ঘা' শব্দের অর্থ বলতে কোনও শিক্ষিত বাঙালীকে অভিধানের সাহায্য নিতে হয় না। ছোটবেলা থেকে সে যা শুনে আসছে তাই চটপট মুখের ওপর জানিয়ে দেয়। তরুণ কবি প্রথমে বিস্মিত হয়ে যায় এই ভেবে যে এত সহজ একটি শব্দের অর্থ আমি কেন তার কাছে জানতে চাইছি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিজেকে সে সপ্রতিভ করে বলে 'উরু'; শুধু বলেই না, হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় শরীরের কোন অংশটির নাম 'জঙ্ঘা'। হাতের কাছেই ছিল রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা'। আমি তা খুলে ওকে দেখাই 'জঙ্ঘা' শব্দের অর্থ—হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত। জাং। এরপর তরুণ কবি যথার্থই বিস্মিত হলো।

সে চলে যাবার পর আমি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' খুলে বসি। 'জঙ্ঘা' শব্দের প্রথম চারটি অর্থ এরকম :

১. 'গমন সাধন', জানু-গুল্‌ফের মধ্যভাগ; প্রস্থতা, জাঙি।

২. পদের উপরিভাগ, উরু

৩. রথশকটের অংশবিশেষ

৪. খট্টার অংশবিশেষ

তরুণ কবি তাহলে ভুল বলেনি দেখছি। কিন্তু পদের উপরিভাগ বলতে কোন অংশ? গোড়ালি বা হাঁটুও কি উরু? প্রত্যঙ্গনির্দেশে হরিচরণের সঙ্গে রাজশেখরের

এরকম পার্থক্য হচ্ছে কেন? বা কোথায় যেন অস্পষ্টতা দেখেই যাচ্ছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষের' ভূমিকায় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের অভিধান এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর "চলন্তিকা" বাঙ্গালা ভাষার যথাক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ, মধ্যম ও লঘু অভিধান বলিয়া পরিগণিত হইবে।' অভিধানগুলির শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সংশয়ের অবতারণা না করেই বলা চলে কিছু কিছু শব্দার্থ যেন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, সেগুলি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। দুই মনীষীর দুটি কালজয়ী অভিধান পাশাপাশি মিলিয়ে দেখে দায়িত্বের সঙ্গেই এই উক্তি করছি। উদাহরণ হিসেবে শুধু 'জজ্ঞা' শব্দটির কথা উল্লেখ করলাম।

'চলন্তিকা' শব্দটি "চলন্তিকা" অভিধানে নেই। 'চলন্ত' পর্যন্ত এসেই অভিধানকার অন্য শব্দে পাড়ি দিয়েছেন। ছিদ্রান্বেষণ নয়, অভিধান নাড়াচাড়া করতে করতেই এগুলি আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হলো অভিধান সংকলিত ও মুদ্রিত হয়ে পড়ে থাকলে চলে না। ভাষা বেগবতী নদীর স্রোতের মতো। নিরন্তর ভাষা ও শব্দার্থ তৈরি হয়ে যায়, পুরনো শব্দ পায় নতুন আয়তন। তারপর আবার শব্দের পর শব্দ এক একটি ভাষার শরীর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। যেমন ধরুন 'ঘেরাও' শব্দটি। রাজনৈতিক দলগুলির একটি বিশেষ পর্বের ক্রিয়াকলাপের ফলে 'ঘেরাও' শব্দটি একটি অতিপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে প্রযুক্ত হল। 'ঘেরাও' শব্দটির এই অর্থ কোন বাঙ্গলা অভিধানে নেই। তিনটি সুবিখ্যাত অভিধান সংকলিত হবার পরের ঘটনা হিসেবে ঘেরাও-এর যা তাৎপর্য তা আমরা কী করে ওই আগের অভিধানগুলিতে পাবো? 'প্রেম' শব্দটি সব বাঙলা অভিধানেই আছে। কিন্তু ইদানীং 'প্রেম করা' বলতে যা বোঝানো হয় সেই অর্থে 'প্রেম' শব্দটির ব্যাখ্যা নেই বাংলা অভিধানে। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের জন্য শব্দের অর্থও সুনিশ্চিতভাবে বদলায়। 'শান্ত' শব্দটি গুণবাচক বিশেষণ হিসেবেই আমরা জানি। কিন্তু 'ছেলেটি খুব শান্ত' বললে ছেলেটির চরিত্রের নিরীহ যে দিকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়, তা কি অনেকেই এখন পছন্দ করেন? 'প্রেম করা' ইংরেজি 'courtship' বোঝাতে বাঙলা ভাষায় প্রচলিত হয়ে গেলেও এখন এই শব্দবন্ধ অনেকটা 'Flirting Sense'-এ ব্যবহৃত হচ্ছে। নতুন অভিধান সংকলিত হলে অবশ্যই 'প্রেম করা'-র নথিভুক্ত অর্থ আমরা পাবো।

'ঘেরাও' নিয়ে রাজনীতির কথা কিছু আগে বলেছি। রাজনৈতিক মঞ্চে

আরেকটি ইডিয়ম ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে—বক্তব্য রাখা। এখন বক্তব্য রাখছেন শ্রী—। এই ইডিয়ম এ ভাষায় এল কী করে? নিঃশব্দে কীভাবে স্থান করে নিল নিজের? নতুন অভিধানে এর ইতিহাস থাকবে। 'Politicalisation of language' কথাটি সম্ভবত অরওয়েলই বলেছিলেন। আমরা-বিশ্বাস করি বা না করি, চাই বা না চাই, বেশ কিছু রাজনীতির কথ্য ভাষা আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষায় ঢুকে যাচ্ছে। যেমন, চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করুন, কবর দিন, মোকাবিলা করুন, বদলা নিন, মুর্দাবাদ ইত্যাদি বাক্য ও শব্দগুলি। 'Agression' কবে থেকে হলো আগ্রাসন? 'ঘুণ-ধরা সামাজ্য' কথাটাই বা কবে থেকে আমরা বলতে শিখলাম? কিংবা অমুকের 'চামচা'?

এইজন্যে বলছি অভিধান সংকলন একটি ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ভাষার ক্ষেত্রে শেষ কথা কি বলা যায়? মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন তার ভাষা নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। নেবে নতুন অজানিত বাঁক। মূল ভাষার বৈচিত্র্য বাড়বে। এ কাজ একা কোন সংকলনের নয়। উদ্বুদ্ধ, নিবেদিতপ্রাণ সংকলকরা ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট কাজ করেছেন। এখন প্রয়োজন যৌথ প্রচেষ্টার। ভাষাতত্ত্ব আজ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র। পুরনো তত্ত্ব ও থিয়োরির বেশ কয়েকটিই আজ বাতিল হয়ে গেছে। সবটাই এখন বিজ্ঞানের চোখে দেখা হয়। এখন প্রয়োজন একদল সক্ষম ভাষাবিজ্ঞানীর, যাঁদের যৌথ প্রচেষ্টা চিরকালীন, সুবৃহৎ একটি সংকলন কর্মের সূচনা করবে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষের' ভূমিকায় আচার্য সুনীতিকুমার লিখেছেন, 'আমাদের দেশে team-work বা যৌথভাবে চর্চা সম্ভবপর হইতেছে না।·যে ভাবে ইংরেজ জাতির সমস্ত পণ্ডিতগণ মিলিয়া অক্সফোর্ড ডিকশনারি তৈয়ারী করিয়া তুলিয়াছেন, সেভাবে কোনও কাজ ইদানীং বঙ্গদেশে হয় নাই। বিশেষতঃ অভিধানের কাজ।···আমাদের দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বা বিশ্বভারতীর সমাদর আছে, কিছু শক্তি নাই—অর্থবল নাই। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভার চেষ্টায় "হিন্দী শব্দসাগর" নামে হিন্দী ভাষায় যে বিরাট কোষগ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্রূপ বিরাট কোষগ্রন্থের ভার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ লইতে পারিলেন না।' ১৩৭২-এর অগ্রহায়ণের এই লেখা। তারপর বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু অচলায়তন অবস্থার এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। অর্থবল নেই বলে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায়? একটি প্রামাণ্য সর্বাধুনিক অভিধান সংকলনের কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য আমাদের আত্মসন্তুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোন চেষ্টা করেছেন? সমস্যার সুরাহার জন্য কি তাঁরা বাঙলার

শিক্ষিত সমাজের কাজে আবেদন করেছেন? যোগাযোগ করেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে? মনে পড়ে না। আচার্য সুনীতিকুমার 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' কেনার জন্য বাঙালীদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। বাঙালী সাড়া দিতে ভোলেনি। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর প্রথম মুদ্রণ বহুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে এর চাহিদা দেখে বোঝা যায় অভিধান বাঙালীর কত প্রয়োজনীয়। সাধারণ ডেস্ক্ বা কলেজ অভিধান নয়, বাঙালী চায় Specialized কোষগ্রন্থ। OED বা Oxford English Dictionary-র মতো কোন অভিধান যখন আমাদের নেই, অন্তত সুখের কথা যে হরিচরণের দুটি খণ্ড আবার, দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হতে চলেছে।

সহায়ক গ্রন্থ : এনসাইক্লোপিডিয়া বিট্রানিকা।
বাংলা অভিধান: জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু।

ব্যক্তিগত রচনা

হে সমালোচক !

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একদিন আমার কার্যক্ষেত্রের টেবিলের ওপর দেখলাম একটি পত্রিকা পড়ে আছে। যেমন অনেক পত্র পত্রিকাই থাকে। কিন্তু সেই পত্রিকাটির অভিনবত্ব এই যে তার মলাটের ওপরেই বেশ কড়াভাষায় আমার সম্পর্কে কিছু লিখে ছাপা হয়েছিল। নিশ্চয়ই পত্রিকাটির কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন যে ঐ রচনা ভিতরে ছাপা হলে আমার চোখে না-ও পড়তে পারে। তাঁরা ঠিকই ভেবেছিলেন। এই ধরনের রচনা, দু' চার লাইন চোখ বুলিয়ে চিনতে পেরে, আমি সরিয়ে রেখে দিই সাধারণতঃ।

সেই পত্রিকাটি ডাকে আসে নি। কেউ হাতে করে এনে আমার অনুপস্থিতিতে সেটি রেখে চলে গেছে। অর্থাৎ যাতে প্রথমেই এসে আমার চোখে পড়ে। লেখাটি মলাট থেকে গড়িয়ে গেছে ভিতরের পৃষ্ঠায়, সেটুকু আর আমি পড়িনি, কিন্তু আমি চিন্তা করতে বসেছিলাম, এই ধরনের সমালোচকের প্রকৃত মনস্তত্ত্ব কী? (১) তিনি বাংলা সাহিত্যের উপকার করবার জন্য কঠোরভাবে খারাপ রচনা নির্মূল করতে চান? (২) তিনি কি মনে করেন, তাঁর সমালোচনা পড়ে আমার মতন লেখকরা রচনার মান উন্নত করবার জন্য যত্নবান হবে? বা ব্যস্ত হয়ে পড়বে? (৩) তিনি ভুল করে একদিন বরবটি ভেবে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আচ্ছা, এর শোধ নেবো? (৪) যারা আনন্দবাজারের সঙ্গে সংযুক্ত তাদের তিনি দু' চক্ষে দেখতে পারেন না? (৫) শিশু যেমন বয়স্কদের সমাবেশে চ্যাঁচামেচি করে নিজের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করায়, সেই রকম কিছু? (৬) অথবা, তার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে?

একমাত্র শেষোক্ত বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। জগৎ সংসারে আমি এখন পর্যন্ত কারুর প্রতিই সচেতনভাবে ব্যক্তিগত শত্রুতার ভাব পোষণ করি না। সে রকম কোনো কারণই এ পর্যন্ত ঘটেনি। যদি কেউ আমার প্রতি তা পোষণ করেন, তবে সেটা নিতান্তই একতরফা এবং নিশ্চিত কোনো ভুল বোঝাবুঝি প্রসূত। কিন্তু বাকি পাঁচটি কারণ সম্পর্কে আমার খটকা থেকে যায়।

লেখকের উচিত না কোনো সমালোচনার উত্তর দেওয়া। যদি না কোনো

তথ্যগত ভুল সম্পর্কে বিতর্ক থাকে। তবু আমি দু'একজায়গায় ভুল করে এরকম উত্তর দিয়ে ফেলেছি। দৈবাৎ কোনো সমালোচনা পড়ে ফেলার পর আমার মনে হয়েছে, না, না, উনি ভুল বুঝেছেন আমাকে, আমি ওরকম কথা বলতে চাইনি, এটা ওঁকে জানানো দরকার। পরে বুঝেছি, সেই জানানোটাও ভুল। আমার রচনার মধ্য দিয়ে যদি সঠিক জানাতে না পারি,তাহলে সংযোজনে জানাবার চেষ্টাটা হাস্যকর। আমি সেরকম হাস্যাস্পদ হয়েছি, বেশী না, দু'একবার মাত্র। আর পড়বোও না, উত্তরও দেবো না। সমালোচকদের বিষয়ে এই আমার শেষ রচনা।

যে-কটি সমালোচনা এ পর্যন্ত পড়েছি, তাতে আমার কোনো উপকার হয়নি। ছাপার হরফে ব্যর্থ বিদ্রূপ, গালাগাল মন্দ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ভেতরে ভেতরে কিছু পোড়ে। কারণ আমার নিজের গালমন্দ করার অভ্যেস নেই। একজন লেখক যা পারে তাই-ই লেখে। তার থেকে ভালো লেখার ক্ষমতা তার নেই বা সেই সময় ছিল না। ভালো লেখা একটা সাঙ্ঘাতিক কঠিন কাজ, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত একজন লেখকও প্রকৃত ভালো লেখা লিখতে পারে নি। নীল সিন্ধুর ঠিক মাঝখানে এক ক্ষুদ্র প্রবাল দ্বীপে নিঃসঙ্গ বাতিঘর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃত ভালো লেখা। সকলেই সেইদিকে যেতে চায়। যে যে-পর্যন্ত পৌঁছোয়। সাঙ্ঘাতিক পরিশ্রম ও অনেকখানি আয়ু ক্ষয় করে একটি রচনা সমাপ্ত করার পরও বুঝতে পারি, ঠিক জায়গায় পৌঁছোনো গেল না। তখন দুঃখ হয়। সেই দুঃখই পরবর্তী রচনাটির উৎস। আর, কেউ একজন কোনোই পরিশ্রম না করে এক কলমের খোঁচায় সেটা উড়িয়ে দিলে বলতে ইচ্ছে করে, তুমি অনধিকারী।

প্রতিদিনই কিছু না কিছু পড়ে ফেলা আমার অভ্যেস। এটা আমার জন্মরোগ। নির্বাচনের বিশেষ সুযোগ নেই, আয়ত্তের মধ্যে যা পাই তাই-ই পড়ি। যেটা ভালো লাগে না, মাঝপথে ছেড়ে দিই, কিন্তু দৌড়ে গিয়ে সেই লেখককে বলতে যাই না, শালা, কেন এত খারাপ লিখিস রে? বলতে যাই না, কারণ আমি জানি, এই খল্ সংসারে আমার জীবৎকালে আমার পাঠযোগ্য বইয়ের অভাব হবে না। তাই মাথাব্যথা নেই অপাঠ্য গ্রন্থ সম্পর্কে।

দেশ পত্রিকাতে 'একা এবং কয়েকজন' নামে আমার একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সবেমাত্র যখন তিনটি কিস্তি বেরিয়েছে সেই সময় একদিন সুপণ্ডিত ও সুলেখক নিত্যপ্রিয় ঘোষ আমাকে বললেন, ও উপন্যাসে আপনি কী লিখবেন আমি বুঝে গেছি! এবং অবিলম্বে সেই মর্মে চতুরঙ্গ পত্রিকায় উপন্যাসটি বিষয়ে খোঁচা মেরে লিখলেন। এ প্রকার সমালোচনা সারা

পৃথিবীর মধ্যে বুঝি শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব। ঐ উপন্যাসটি শেষ হয়েছিল মোট একশো সাত কিস্তিতে। মাত্র তিন কিস্তি পড়ে উপন্যাসটি বিষয়ে অবগত হওয়া স্বয়ং শার্লক হোমসের পক্ষেও অসাধ্য ছিল। কারণ, তা আমার নিজেরও জানা ছিল না। দু'একটি লক্ষণ দেখে আমার চিন্তার গতিবিধি নিরূপণ করা হয়তো কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনো-বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু নিত্যপ্রিয়'র সেরকম কোনো খ্যাতি নেই। সম্ভবত ধীমান নিত্যপ্রিয় কৌতুক করেছিলেন।

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল 'অচল পত্র' নামে একটি পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একাধিক লেখককে পেড়ে ফেলতেন। তুলোধোনা করা যাকে বলে। কিন্তু ব্যাপারটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল খুব মজার। সবাই জেনে গিয়েছিল নানান্ তীব্র ঝাঁঝালো রসিকতা মিশিয়ে আক্রমণ করাই দীপেন্দ্রর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, তিনি ও ছাড়া আর কিছু জানেন না, তাঁর কাছ থেকে গভীর স্তরের কোনো কথা আশা করা যায় না, সুতরাং তাঁর পত্রিকার প্রতি সংখ্যাই বেশ রসিয়ে রসিয়ে পড়া যেত। হায়, সে-রকম ঝলমলে রসিকতাবোধ ইদানীং আর সমালোচকদের মধ্যে দেখতে পাই না।

কোনো কোনো সমালোচক নিজেকে মার্কসবাদী বলে বিজ্ঞাপিত করেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই মূর্খ এবং ভণ্ড। প্রকৃত মার্কসবাদী সমালোচক এ পর্যন্ত একজনও দেখিনি। মার্কসবাদ এঁদের কাছে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতন। স্বয়ং মার্কস এঁদের রচনা দেখলে শিউরে উঠতেন। মার্কস জানতেন সাহিত্যের মধ্যে রস জিনিসটা কী। হয়তো বাংলা-মার্কসবাদীদের রচনা পড়ে খুশী হলেও হতে পারতেন লেনিন। লেনিন মহামানব ছিলেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর সাহিত্যবোধ ছিল না উচ্চাঙ্গের। সকলের সব কিছু থাকে না, এমন কি মহামানবদেরও থাকে না।

যাঁরা কোনো বামপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত, সেই সব সমালোচকদের প্রতি বোধহয় একটা লিখিত বা অলিখিত নির্দেশ আছে যে নিজেদের দলের বাইরে যে কোনো লেখককেই নস্যাৎ করতে হবে। ব্যাপারটা বোঝা যায়। এবং তাঁদের কাজটাও সহজ। যে-হেতু অধিকাংশ বামপন্থী দলগুলির মধ্যেই একজনও লেখক নেই, সুতরাং তাঁরা চোখ বুজে সবাইকে গালাগাল দিয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শৌখিন মার্কসবাদীদের নিয়ে। এরা কোনো মিছিলে বা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয় না। এরা বুদ্ধিজীবী। পেশায় সাধারণত এরা অধ্যাপক, বিজ্ঞাপন-মুশাবিদাকারী, ব্যাঙ্ক-চাকুরে বা পত্রিকার সংবাদদাতা হয়, হিন্দীতে যাদের

বরে পত্রকার। এরা যে-যার চাকরি বাকরির উন্নতির চেষ্টায় ব্যস্ত, কেউ টাকা জমিয়ে বাড়ি বানায়, বোনাস প্রভৃতি ব্যাপারে অত্যুৎসাহী, অথচ এরাই সমালোচনার সময় মসীধারণ ক'রে গরীবের জন্য কাতর, গণতন্ত্রের প্রতি খড়্গহস্ত, এবং রাস্তার ভিখারীদের কথা লেখবার জন্য লেখককুলও কেন ভিখারী হচ্ছেন না, এই দাবীতে গর্জমান। এদেরই আমি ভণ্ড বলেছি। ইদানীং বঙ্গে এদের সংখ্যাই প্রভূত।

নকশাল আন্দোলনের চূড়ান্তকালে এক নকশাল যুবক আমাকে বলেছিল, এসব কী লিখছেন? এসব ছেড়ে দিন! নতুনভাবে লিখুন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই নতুন লেখা কী রকম হবে, কোনো আভাস দিতে পারো ভাই? সে লুকিয়ে এনে একটি সাম্প্রতিক চীনা উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ দিয়েছিল আমাকে। বইটি মুর্শিদাবাদে গোপনে ছাপা। বইখানি সমাপ্ত করার পর আমি বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসেছিলাম। এতখানি ধৈর্য আমি কোনো উপন্যাস পাঠের জন্য আগে ব্যয় করিনি। পরে ছেলেটির সঙ্গে আবার দেখা হলে আমি বলেছিলাম, পৃথিবীর সব মানুষ খেয়ে পরে বাঁচুক, ধন বৈষম্য দূর হোক, শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপিত হোক—এটা আমিও মনে প্রাণে চাই। এসব আনবার জন্য যদি সাহিত্য শিল্পকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই। মানুষের জীবনের চেয়ে আর কিছুরই দাম বেশী নয়। এদেশে সেরকম সমাজের প্রতিষ্ঠা হলে আমি বরং স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রামে গিয়ে মাটি কাটবো, কিন্তু এক লাইনও লিখবো না। পড়বোও না। ঐ রকম উৎকট উপন্যাস আমি ছুঁয়েও দেখবো না। উপন্যাসটিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এক জায়গায় ছিল যে, গ্রন্থের নায়ক সারাদিন বহুরকম ভালো ভালো কাজে ব্যস্ত থাকায় সেদিন সে মাও সে তুং-এর রচনাবলী পাঠ করতে গিয়েছিল ভুলে। স্বপ্নের মধ্যে সেই কথা মনে পড়ে যায় তার, সে ধড়ফড় করে উঠে বসে এবং শেষ রাত্রে, ঘরের বাতি জ্বেলে সে মাও-এর রচনা পাঠ করতে বসে, পড়তে পড়তে তার চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

আমি পুরোপুরি নাস্তিক, এই নতুন ধর্মবাদও গ্রহণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এর চেয়ে মাটি কাটা অনেক ভালো। সাড়ে তিন হাজার বছরের যে সাহিত্যের ট্র্যাডিশান, আমি সে সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছুতে সেই স্বাদ পাবো না। যে-সাহিত্য ব্যক্তি মানুষের কথা বলে, যা একা একা উপভোগ করবার। দারিদ্র্য নির্মূল করবার কাজে সাহিত্যকে হাতিয়ার করার মতন স্থূল চিন্তার অংশীদার হওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না ইহজীবনে। যে বিশ্বাস করে, সে করুক।

অনেকে বিশ্বাস করে না, বা করেন না, তাদের বা তাঁদের গল্পে কবিতায় থাকে ব্যক্তি মানুষের কথাই, থাকে ভাষা-সৌন্দর্যের নেশা অথবা ভাষা নিয়ে মারপ্যাচ কিন্তু সমালোচনা করবার সময় তারাই হঠাৎ দারুণ প্রগতিশীল হয়ে ওঠে, গরীব, এস্টাব্লিশমেণ্ট, বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে দাপাদাপি করে। বিষ্ণু দে মার্কসবাদী, কিন্তু তাঁর কবিতাগুলি তাঁদের ভাষাতেই বুর্জোয়া সাহিত্য নিশ্চিত। আবার কোনো লেখককে দেখি, এই সপ্তাহে এস্টাব্লিশমেণ্টের জালে আবদ্ধ লেখকদের বিষয়ে মর্মভেদী রচনা লিখে পরের সপ্তাহেই যুগান্তরের রিপোর্টারি করতে পাহাড়ে চলে গেল! বড় কাগজ অর্থাৎ তথাকথিত এস্টাব্লিশমেণ্টে লেখার চেষ্টা করেও সুযোগ না পেয়ে অথবা চাকরির চেষ্টা করেও চাকরি না পেয়ে হঠাৎ ঐগুলি বা ঐগুলির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য লেখকদেরও গালাগালি শুরু করে দেয় প্রগতিবাদী সেজে কেউ কেউ, এরকমও দেখেছি। কিন্তু এসব উল্লেখ করতে আমার লজ্জা করে। এসব দুঃখের কথা।

কোনো লেখকের পক্ষে সমসাময়িক কালের সাহিত্যের সমালোচক হওয়া খুবই শক্ত কাজ। লেখকের নিজস্ব অহমিকাই প্রধান অন্তরায়। সেইজন্যই সিরিয়াস লেখকরা পূর্ববর্তী সাহিত্যের বিচার করেন,—টি এস এলিয়ট যেমন শেলী বিষয়ে, রবীন্দ্রনাথ যেমন মাইকেল বা বঙ্কিম বিষয়ে—কিন্তু সমকাল সম্পর্কে নীরব। এটাই শালীনতা। কিন্তু অনেকে এখন এটা মানেন না। এখন পরস্পর পিঠ চাপড়ানি এবং পরস্পর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি—দুটিই বেশ চলছে। ছাপা অক্ষর এখন আনকেপ্ট ওয়াণ্ডার্স-এ ভর্তি। কথায় আছে, ব্যর্থ লেখকরা গুলি খাওয়া বাঘ। তারাই সমালোচক। যে নিজে গল্প উপন্যাস কবিতা কিছুই লিখতে পারে না, সে-ই এগুলির নির্মম বিচারক সেজে বসে। এতে নতুনত্ব নেই। কিন্তু যে লিখতে পারে, অথচ লেখার জন্য সময় বা মেধা না দিয়ে তার অপব্যয় করে বনের মোষ তাড়ানোর কাজে, তার ব্যবহার কৌতূহলজনক। যেমন আমাদের সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। ছোট ছোট পত্র পত্রিকায় সে নানান্ চুটকি লেখায় চৌকোশ ভাষায় অনবরত নিজের সময়কার লেখকদের নিন্দে করে যাচ্ছে। কী দারুণ কায়দা সে সব রচনার, ভাষা যেন মাকড়সার জালে শিশির বিন্দু, প্রতিটি শব্দ যেন দামী লঙ্কা, পড়তে পড়তে আহা আহা বলতে হয়। এখন কোথাও তার লেখা বেরুলেই অনেকে বলে, দেখি, দেখি, সন্দীপন আবার কাকে দিল! দেখি দেখি, সন্দীপন খোঁচাখুঁচির আর কত ভালো ভাষার কায়দা বার করলো! প্রশংসার ভাষা সব সময়ই সীমাবদ্ধ, গালাগালির ভাষা যে কত অঢেল চমকপ্রদ হতে পারে, তার

উদাহরণ আছে ভক্তিভূষণ মণ্ডলের অপরাধ জগতের শব্দকোষে। সন্দীপনের সংগ্রহ তারচেয়েও অনেক অভিনব। সে প্রায় দীপ্তেন্দ্রকুমারের জায়গা নিয়ে নিলো, নিয়ে নিলো! ছোট ছোট পত্র পত্রিকাগুলো অতি উৎসাহের সঙ্গে তাকে বলে, সন্দীপন, বা সন্দীপনবাবু বা সন্দীপনদা, ঐ রকম আর একটা লেখা চাই, আরও মুচমুচে, আরও ঝাঁঝালো, আপনার যা দারুণ ভাষা না, পড়তে এত মজা লাগে! দেখা যাচ্ছে, বড় বড় পত্রিকার মতন, ছোট পত্রিকাদেরও একরকম জাল আছে, যাতে জড়িয়ে পড়ে এক একজন লোক। তাকে দিয়ে ইচ্ছে মতন লেখায়। যারা লিখতে পারে না, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু সন্দীপন তো লিখতে পারে, সে কেন এই সব এলেবেলে কাজে সময় নষ্ট না করে নিজের নিজস্ব লেখা লেখে না? কে কার বই ব্যাগে ভরে বিক্রি করে তাতে তার কী যায় আসে? কোনো লেখকের আসে যায়?

এ সব সমালোচকদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ: এখন ছোটো আছো তো, আগে বড়ো হও, বড়ো হলে অনেক কিছু জানতে আর বুঝতে পারবে!

আলোচনা

"আমারে ভুলিও প্রিয়"

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সঙ্গে তার জননীর নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হয়। বোধহয় এর মধ্যে মানুষের পরবর্তী জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত থাকে। জন্মমুহূর্তে যে বন্ধন ছিন্ন, সারাজীবন ধরেই সে কাজ চলতে থাকে। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে নির্মম সত্য হ'লো মৃত্যু। কোনো প্রিয়জনকে হারানোর অভিজ্ঞতা হয় নি এমন লোক পৃথিবীতে নেই। প্রিয়জনের মৃত্যুর মতোই আরেক মৃত্যু আছে তেমনি শোকাবহ। সে মৃত্যু কৈশোরের মৃত্যু যৌবনের মৃত্যু।

এ মৃত্যু কি ভাবে আসে? কৈশোর কখন যৌবনে পরিণত হয় আর যুবা কখন প্রৌঢ় হয় কেউ জানে না। কিন্তু হঠাৎ কখন হাওয়ায় কোন ফুলের গন্ধ ভেসে আসে —খেতে বসে কোনো রান্নার স্বাদে হঠাৎ মনে পড়ে যায় আমার একটা পুরাতন কাল ছিল। আমি এগিয়ে এসেছি অনেকটা। ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে সবচেয়ে বেশী পিছিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য ক'রে গান। সবচেয়ে আনন্দিত পশ্চাদপসরণ! "ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে মাঠের বাটে যাই" প্রথম কবে শুনেছিলাম? কিংবা সেই গান—"বাঁশুরিয়ারে কোথায় শিখেছো বাঁশী বাজান"। কলকাতার রাস্তায় তখন লোক কম চলতো বাসে কেউ ঝুলে যেত না। বোম্বাই যাবার আগে শচীন কর্তার গান আমাদের কৈশোরের সম্পদ। শচীনদেব আজ নেই। নেই সায়গলও। "নাই বা ঘুমালে প্রিয় রজনী এখনো বাকী" গেয়ে আমাদের আগের প্রজন্মের মানুষজন বিহ্বল হয়ে যেতেন। চোখ বুজে কান পাতলে এখনো বোধহয় শোনা যাবে "শুনি ডাকে মোরে ডাকে" কিংবা "আমি তোমায় যত"। এ গানগুলি অনেক সুখের দিনের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জ্ঞান গোস্বামীর 'যোগীশ্বর-বর ভোলা মহেশ্বর' কিংবা 'দীনতারিণী দুঃখহারিণী ভবানী মা' অপূর্ব। জ্ঞান গোস্বামী শচীন কর্তা যে সময় নজরুল সঙ্গীত গাইতেন তখন নজরুল সঙ্গীত বলতে বাইজী বাড়ীর খ্যামটা গান বোঝাত না। জ্ঞান গোস্বামীর "শূন্য এ বুকে পাখী মোর"

যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বুঝবেন আমি কি বলছি। হয়তো এখনকার গায়করাও খুবই ভাল গান করেন কিন্তু আমি তাতে তেমন আনন্দ পাই না, কোথায় যেন অভাব থেকেই যায়।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় চলে যাওয়াতে আমার সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির সঙ্গে আরো একটা বাঁধন কেটে গেল। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে চোখে দেখি নি। শুধু মেগাফোন রেকর্ডের মোড়কের ওপর ছবি দেখেছি। কিন্তু তাঁর গানের সঙ্গে পরিচয় কত কাল হয়ে গেল। মেগাফোনের সেই হরিণ আঁকা নীলচে রেকর্ডে কত গানই না শুনেছি। সেদিন রেডিওতে যখন শুনলাম ভীষ্মদেব আর নেই, তখন যে কটি ভীষ্মদেবের রেকর্ড আমার আছে সবগুলি বার করে আবার শুনলাম। বলা বাহুল্য, অসাধারণ মিষ্টি উদাস করা সেই সব গান, শুধু উদাস করা নয়, কি অসাধারণ প্রায় অলৌকিক কণ্ঠ সম্পদ! আমি শারীরবিদ্যায় পারদর্শী নই। তাই হৃদয়ের ঠিক কোন কামরায় আঘাত লাগলে ব্যথা জাগে তা বলতে পারব না। কিন্তু এটা জানি গান শুনে বুকে সত্যি কষ্ট হয়। "নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো" "জাগো আলোকলগনে" "দুঃখ হামে ক্যায়সে কহু," "বনঠন কর আয়ী রে যশোদা" প্রাণ ভরিয়ে দিচ্ছিল। বহুবার শোনা আর একটি গান "যদি মনে পড়ে"। তার একটি কলি, 'আমারে ভুলিও প্রিয়' ঘরের সবগুলি চোখ সজল করে তুলেছিল।

সেদিন মনে পড়ল ব্যক্তি ভীষ্মদেব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। ভীষ্মদেব কেন গান ছেড়ে দিয়েছিলেন? পণ্ডিচেরী গেলেন কেন? কেনই বা ফিরে এলেন? অবশ্য কিছু কিছু গুজবে কান দেওয়ার মতো অন্যমুখে শুনেছি, পূর্ব ভারতের শিল্পীদের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতে সহজে জায়গা মেলে না। যন্ত্রসঙ্গীতে ৺আলাউদ্দীন এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের কৃতিত্বে আজ পূর্বভারতকে আর অবহেলা করার উপায় নেই, কিন্তু আলাউদ্দীনকে তার জন্য অনেক কষ্ট ও অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ভীষ্মদেবের কি হয়েছিল? প্রতিভার প্রায় তুঙ্গে কেন বেছে নিলেন স্তব্ধতা? সুধী সমাজের নিশ্চয় অনেকে সে খবর জানেন, আমি জানি না। বোধহয় জানতে ভয়ও পাই। আমার কাছে তাঁর কণ্ঠ অনেক দিনের আনন্দ বেদনার স্মৃতি। সে কণ্ঠ আর শোনা যাবে না।

আব্বাসউদ্দীন, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীনদেব বর্মণ, জ্ঞান গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কে. এল. সায়গল, কানন দেবী, দিলীপ রায় আর পঙ্কজ মল্লিক তাঁদের সুরেলা কণ্ঠ তাঁদের তদগত নিষ্ঠা দিয়ে তাঁদের অনবদ্য সঙ্গীত পরিবেশন করে আমাদের জীবন ভরিয়ে রেখেছিলেন। প্রতিভার এরকম যৌথ পরিবার বাঙ্গলাদেশে

আর কি কখনো গড়ে উঠবে! যে কটি নাম লিখলাম তাঁদের মধ্যে এখনো আমাদের মধ্যে আছেন দিলীপ রায়, পঙ্কজ মল্লিক আর কানন দেবী। ভগবান তাঁদের দীর্ঘজীবন দান করুন। তাঁদের সঙ্গীত কিন্তু অনেক দিনই বন্ধ। ভীষ্মদেব নীরব ছিলেন, এখন প্রাক্তন হয়ে গেলেন, শারীরিক ভাবে। ভীষ্মদেবের গানের একটি কলি ওপরে লিখেছি 'আমারে ভুলিও প্রিয়'। ভুলে যাওয়াই পৃথিবীর নিয়ম। ভুলতে বলি কি না বলি একদিন সবই মুছে যায়। আজকের তরুণ তরুণীরা যে গানে দোলা খান যে গান তাঁদের চিত্তকে ভরিয়ে দেয় উন্মাদনায়, তার অনেকটাই আমার অ-সংস্কৃত মনে হয়, জান্তব আর যান্ত্রিক চীৎকার বলে মনে হয়। তেমনি এও আমি জানি আর মানি যে আমাদের ভাললাগার গান তাঁদের একদম বাজে ধরনের মনে হয়। সুতরাং ভীষ্মদেব বেঁচে থাকতেই একটি বিস্মৃত নাম ছিলেন। তাঁকে নূতন করে ভোলবার প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু ভীষ্মদেব যাদের নিজের জন ছিলেন তারা কিন্তু তাঁর অনুরোধ রাখতে পারবে না। তাদের চেতনা জুড়ে ভোর হ'বে তাঁর গলার ভৈরবীতে। মতিমালা নিয়ে তিনি কি করেছিলেন সে ভাবনায় মন তাদের উদাস হবে। আর সবাই ভুলে যাবে একথা নিশ্চিত ভাবে জেনেও অনুরোধ করবে 'আমারে ভুলিও প্রিয়'।

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভীষ্মদেবের রেকর্ডের পূর্ণাঙ্গ তালিকা

১৯২৬ ॥ ভীষ্মদেবের বয়স ষোল। হিজ মাস্টার্স ভয়েস থেকে প্রথম রেকর্ড বেরোয়। রেকর্ড নম্বর পি ৭৪০২। 'পি' মানে প্রেস্টিজ। রেকর্ডের দু'পিঠে দুটো গান। রামনিধি গুপ্তর লেখা। টপ্পা। প্রথম পিঠে: সখি, কি করে লোকেরই কথায় (মিশ্র খাম্বাজ)। দ্বিতীয় পিঠে: এত কি চাতুরী সহে প্রাণ (কাফি সিন্ধু)।*

১৯৩৩ ॥ ভীষ্মদেবের বয়স ২৩ কি ২৪। সম্ভবত দ্বিতীয় রেকর্ড। রেকর্ড নম্বর

* ভীষ্মদেবের দাদা তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ভীষ্মদেবের প্রথম রেকর্ড বেরোয় ১৯২১ কি ২২ সালে, বারো-তের বছর বয়সে। সে রেকর্ড এখন পাওয়া যায় না। রেকর্ড করা হয়েছিল বেলেঘাটায়। ১৯২৬ সালে রেকর্ডটি পুনঃ প্রচারিত হয়।

জে-এন-জি ৫১৩। রেকর্ড গ্রহণের তারিখ ১৭ মার্চ। প্রথম পিঠ: 'মুখ মোড় মোড় মুসকতি' (মালকোষ। খেয়াল-ত্রিতাল)। দ্বিতীয় পিঠ: 'আজ আওরী সখী আনন্দ (আশাবরী। খেয়াল—ঝাঁপতাল)।

১৯৩৪ ॥ 'খনা' রেকর্ড-নাট্যে সুরারোপ করেন। রেকর্ড নম্বর জে-এন-জি ১৫৪-১৬০। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'চাঁদসদাগর' ছায়াচিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা। শৈলেন রায়ের 'ভালোবেসে ডাকে আমায়' (ঠুংরী) ও ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের 'মনে রেখো বলে' (ভৈরবী গজল) গান দুটিতে সুরারোপ করেন—রেকর্ড নম্বর জে-এন-জি ১৪৯—নায়িকা বীণাপাণি দেবী।

নিজেও গেয়েছেন কয়েকটি গান। রেকর্ড নম্বর জে-এন-জি ৫৪৯। বাহার আইরে বাহার। খেয়াল—ত্রিতাল। রেকর্ড গ্রহণের তারিখ ১৭ মার্চ ১৯৩৩।

জে-এন-জি ১২৭৭। ফুলবন কা গেদান ম্যয়কো। দেশী—টোড়ী। খেয়াল—ত্রিতাল। রেকর্ড গ্রহণ ১৭ মার্চ ১৯৩৩।

জে-এন-জি ৬৫৬। প্রথম পিঠ: অব হো লালন মৈকা। বেহাগ। খেয়াল—ত্রিতাল। দ্বিতীয় পিঠ: পিউ পিউ রটত পপৈহীয়া। ললিত। খেয়াল—ত্রিতাল। রেকর্ড গ্রহণ ২৬ এপ্রিল ১৯৩৩।

১০ অক্টোবর ১৯৩৪ আরো দুটো গানের রেকর্ড গৃহীত হয়। প্রথম গান: এরি ফিরত সুজন (জৌনপুরী)। দ্বিতীয় গান: এরি মের কহি (সুগরাই)। কিন্তু প্রকাশিত হয়নি।

১৯৩৪ ॥ শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'বলিদান' ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন। সুরসৃষ্টি করেন ৬টি রেকর্ড-নাট্যে। যথাক্রমে—শকুন্তলা (আগস্ট) অকাল-বোধন (সেপ্টেম্বর) শম্বুক বধ (অক্টোবর) সীতাহরণ (নভেম্বর) উর্বশীর অভিশাপ (নভেম্বর) ফুল্লরা (ডিসেম্বর)। রেকর্ড নম্বর যথাক্রমে জে-এন-জি ২১৩-২১৮, জে-এন-জি ২২০, জে-এন-জি ২২১, জে-এন-জি ২২৭-২৩০, এম-সি-সি ২৩১, জে-এন-জি ২৩২-২৩৮।

তাঁর সুরারোপিত কয়েকটি রেকর্ড বেরোয়। রেকর্ড নম্বর জে-এন-জি ২২৫। কথা: কাজী নজরুল ইসলাম। কত কথা ছিল বলিবার। গায়িকা: আঙ্গুরবালা।

জে-এন-জি ২১২। প্রথম পিঠ: হের কাননে মাধবী জাগে। দ্বিতীয় পিঠ: ঘরে নাহি রয় পরাণ উতলা। কথা: অজয় ভট্টাচার্য। গেয়েছেন জ্ঞান দত্ত ও মিস তারা।

জে-এন-জি ১৭১। প্রথম পিঠ: কালী কালী বল না রে মন (বেহাগ। কথা: প্রত্যোৎকুমার বসু)। দ্বিতীয় পিঠ: বারে বারে ডাকি শ্যামা (মালকোষ। কথা: মতিলাল রায়) গেয়েছেন যুগল পাল।

ভীষ্মদেব নিজে গেয়েছেন কয়েকটি গান। রেকর্ড নম্বর ৬৯৮। প্রথম পিঠ: রুত বসন্ত আপনি (রাগেশ্রী বাহার)। দ্বিতীয় পিঠ: পিয়া পরদেশ (ধানেশ্রী)। রেকর্ড গ্রহণ ১০ অক্টোবর ১৯৩৪।

জে-এন-জি ৭২১। বরসে মেহরওয়া (গৌড় মল্লার)। রেকর্ড গ্রহণ ৮ মার্চ ১৯৩৫।

জে-এন-জি ১২৭৬। মোরে রাজা যোবন বরসন। দেশ মল্লার। ঠুংরী—ত্রিতাল। রেকর্ড গ্রহণ ৮ মার্চ ১৯৩৫।

১৯৩৬ ॥ জে-এন-জি ৮৫০। প্রথম পিঠ: ঠংডে সেলামন জা-। তিলং। খেয়াল—ত্রিতাল। দ্বিতীয় পিঠ: হ্যাঁ মন ভাবনিয়া। ধানী। ঠুংরী—ত্রিতাল। রেকর্ড গ্রহণ ৯ জুন ১৯৩৬।

জে-এন-জি ৮৭৮। প্রথম পিঠ: আইরে রুতে বসন্তে—(বসন্ত। খেয়াল—ত্রিতাল)। দ্বিতীয় পিঠ: রসিলি তোরে আঁখিয়া (ভৈরবী। ঠুংরী) রেকর্ড গ্রহণ ৯ জুন ১৯৩৬।

জে-এন-জি ৩৯১। প্রথম পিঠ: ফুলেরি দিন হল যে অবসান (জয়-জয়ন্তী। রাগপ্রধান—ত্রিতাল) দ্বিতীয় পিঠ: শেষের গানটি ছিল তোমা লাগি (মাড়। গজল—রাগপ্রধান) কথা: অজয় ভট্টাচার্য। রেকর্ড গ্রহণ ১২ আগস্ট ১৯৩৬।

সুরারোপিত রেকর্ড-নাট্য বেরোয় ৭টি। যথাক্রমে—সিন্ধুবধ (জানুয়ারী) পূজার দাবী (ফেব্রুয়ারী) সীতার পাতাল প্রবেশ (ফেব্রুয়ারী) কর্ণার্জুন (মার্চ) শৈব্যা (এপ্রিল) মেঘনাদ বধ (আগস্ট) শ্রীদুর্গা (অক্টোবর)। রেকর্ড নম্বর যথাক্রমে জে-এন-জি ২৪৫-২৪৮, ২৫৯-২৬১, ২৬২, ২৬৯-২৮০, ২৯৮, ৩৪৫-৩৬০, ৩৯৩-৩৯৯।

সুরারোপিত রেকর্ড।

জে-এন-জি ৮৬১। শিল্পী আখতারি বাঈ (বেগম আখতার)।

প্রথম পিঠ : বিরহ কে মারী রৈত ন (ঠুংরী)। দ্বিতীয় পিঠ : মোরী কারী সী উমরিয়া (ঠুংরী)।

জে-এন-জি ২৬৬। শিল্পী কানন দেবী। 'কণ্ঠহার' কথাচিত্রে গাওয়া। প্রথম পিঠ : নিশীথ রাতে কে যেন আসে। দ্বিতীয় পিঠ : ভুলে যদি ওগো প্রিয়। কথা : অজয় ভট্টাচার্য।

জে-এন-জি ২৯৬। শিল্পী কানন দেবী। কথা : অজয় ভট্টাচার্য। প্রথম পিঠ : শ্যাম বিনা নিদ নাহি আসে। দ্বিতীয় পিঠ : মরমের ব্যথা রহিল মরমে।

১৯৩৭ ॥ কালী ফিল্মমের 'মুক্তিস্নান' ছায়াচিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা।

স্বকণ্ঠের রেকর্ড। জে-এন-জি ৯১০। প্রথম পিঠ : সৈঁয়া তু এক বৈরী আয়া (পিলু। ঠুংরী—আদ্ধা কাওয়ালী)। রেকর্ড গ্রহণ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬। দ্বিতীয় পিঠ : বামন দেবতা (শংকরা। খেয়াল—ত্রিতাল)।

জে-এন-জি ৪৪৯। কথা : শৈলেন রায়। প্রথম পিঠ : নবারুণ রাগে তুমি সাথী গো (ভৈরবী। রাগপ্রধান—ত্রিতাল)। দ্বিতীয় পিঠ : তব লাগি ব্যথা ওঠে কুসুমি (দেশী টোড়ী। রাগপ্রধান—ত্রিতাল)। রেকর্ড গ্রহণ ১৮ অক্টোবর ১৯৩৬।

জে-এন-জি ৫০৭৮। হারমনিয়াম। প্রথম পিঠ : কাফি মিশ্র (গৎ—ত্রিতাল)। দ্বিতীয় পিঠ : ভৈরবী (গৎ—কার্ফা)।

জে-এন-জি ৯৬০। প্রথম পিঠ : মতি মলিনিয়া (কামোদ। খেয়াল—ত্রিতাল)। রেকর্ড গ্রহণ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬। দ্বিতীয় পিঠ : তুথবা ময় কাসে কহুঁ [তিলোক কামোদ। ঠুংরী – ত্রিতাল]।

জে-এন-জি ৫১৩৭। কথা : অজয় ভট্টাচার্য। প্রথম পিঠ : জাগো আলোক লগনে (রামকেলি। রাগপ্রধান—ত্রিতাল)। দ্বিতীয় পিঠ : যদি মনে পড়ে (কাফি-ভৈরবী)। রেকর্ড গ্রহণ ৭ অক্টোবর ১৯৩৭।

এ ছাড়া আরো একটি গানের রেকর্ড গৃহীত হয় ১৯ আগস্ট ১৯৩৭। কথা : শৈলেন রায়। মনের বনমাঝে কি বাঁশী (রাগ প্রধান)। রেকর্ড বেরোয়নি।

রেকর্ডতালিকা সংকলক গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রবীন্দ্রনাথের বই

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের নামে নানা বই প্রকাশ করে চলেছেন। মহাত্মাগান্ধী, বুদ্ধদেব, খৃষ্ট প্রভৃতি বই যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কেউ জানতেন না। রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় জানতেন না। বিশ্বভারতীর কাছে বাঙালী পাঠক নানাভাবে ঋণী কিন্তু বিশ্বভারতী যেভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা নিজস্ব সম্পত্তির মত ব্যবহার করছেন এবং পাঠক-পাঠিকার প্রতি অন্তহীন উপেক্ষা দেখাচ্ছেন তার জন্য ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত না হয়ে পারি না। রবীন্দ্রনাথের বই যেমন খুশি প্রকাশ করার আইনগত অধিকার বিশ্বভারতীর নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে যথেচ্ছাচারের নৈতিক অধিকারও কি বিশ্বভারতীর আছে? বাংলাদেশের রবীন্দ্রভক্ত, রবীন্দ্রশিষ্য, পণ্ডিত ও লেখক-সমাজ নীরবে শুধু এই যথেচ্ছাচারকে মেনে নিয়েই শান্ত থাকেননি, কেউ কেউ সক্রিয় প্রশ্রয়ও দিয়েছেন। বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে এইভাবে অবহেলা এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশের এই নিতান্ত ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কোন মনীষীর কণ্ঠে প্রতিবাদ শুনিনি। স্বর্গত তারকনাথ সেন একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন "Ways of dishonouring the memory of Tagore are many and Varied···" রবীন্দ্রনাথকে অসম্মানিত করার বহু এবং বিবিধ পথের একটি পথ বিশ্বভারতী দেখিয়েছেন।

১৯৪৮ সালে মহাত্মাগান্ধী নামে রবীন্দ্রনাথের একটি বই প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে আছে দুটি কবিতা, এবং পাঁচটি প্রবন্ধ। এই রচনাগুলি সবই রবীন্দ্রনাথের। অতএব বইটি রবীন্দ্রনাথের। এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন ওঠা মূর্খতা। তবু মূর্খের মতই প্রশ্ন করছি, এই বইতে প্রথমে যে কবিতাটি আছে তা 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির অংশ। 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি কি রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাগান্ধীর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন? যদি না লিখে থাকেন—আমরা জানি যে তিনি লেখেননি—তাহলে কোন্ যুক্তিতে এই অংশটি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হল? মূল প্রশ্ন হল রবীন্দ্রনাথ কি 'মহাত্মাগান্ধী' নামে কোন গ্রন্থ পরিকল্পনা করেছিলেন? সেই পরিকল্পনায় কি এই সব রচনাগুলি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন? যদি চেয়ে থাকেন সেগুলি কি এই ক্রমেই সজ্জিত করতে চেয়েছিলেন? তা' যদি না করে থাকেন, কি করে মেনে নেব যে এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ অনুমোদিত এবং পরিকল্পিত?

একই প্রশ্ন করব ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থ সম্পর্কে। এখানে যে সব কবিতা ও প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে তা কবির জীবৎকালেই ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে

সঙ্কলিত হয়েছিল। যেমন 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বর্তমান সংস্করণেও সেটি রয়েছে। এই গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি বুদ্ধদেব বিষয়ক কবিতাগুলি ছাপা হয়েছে প্রবন্ধগুলির পরে। মহাত্মাগান্ধী গ্রন্থে কবিতা আগে, প্রবন্ধ পরে। এসব কি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ? যদি না হয় কার নির্দেশ? বিশ্বভারতী যদি বলেন রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব বা মহাত্মাগান্ধী বিষয়ক সমস্ত রচনা একত্রিত করে তাঁরা পাঠকসমাজের সুবিধা করে দিতে চেয়েছেন, তাঁদের সাধুবাদ দিয়েও বলব, তাঁরা কেন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন না যে এই গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত এবং অনুমোদিত নয়, এগুলি বিশ্বভারতীর নির্দেশাধীন কোন সুধী ব্যক্তির পরিকল্পিত। এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কেন স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে না যে কোন একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনার সঙ্কলন মাত্র। পাঠক সমাজকে প্রতারিত করার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর নেই একথা স্বীকার করে নিচ্ছি, কিন্তু পাঠক সমাজ সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারেন। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে মহাত্মাগান্ধী, বুদ্ধদেব, খৃষ্ট—এই গ্রন্থত্রয়ের স্থান নেই। কিন্তু বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে এই তিনটি গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটেছে। পাঠক বিনীতভাবে প্রশ্ন করতে পারেন এই তিনটি গ্রন্থ হঠাৎ কোথা থেকে এল? বিশ্বভারতীর সৌজন্যে?

রবীন্দ্রনাথের নব নব গ্রন্থ সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করার এই অভিনব প্রয়োজন হল কেন? মহাত্মাগান্ধী, বুদ্ধদেব, খৃষ্টেই এই দায়িত্ব সম্পন্ন হয়নি। রবীন্দ্রস্বাক্ষরিত সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে রবীন্দ্রনাথের নামে বিশ্বভারতী আরো বই প্রকাশ করে চলেছেন। 'বাংলাদেশ'-এর উন্মাদনা ও উত্তেজনার সময় বিশ্বভারতী বাংলাদেশের পাঠকদের সুবিধার্থে পূর্ববাংলার গল্পও প্রকাশ করেছেন। পাঠক সম্প্রদায় গ্রন্থগুচ্ছের মত সুবৃহৎ গ্রন্থের সবটা পড়তে নাও চাইতে পারে, বিশ্বভারতী তাদের প্রতি মমতাবশত 'মেড ইজি' প্রকাশ করে দিলেন। অদূর ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের নামে সন্দেশ বা রসগোল্লা নামে বই বেরুলেও বোধ করি আমাদের আপত্তি করাটা ঠিক হবে না।

২

বিশ্বভারতী আর একটি মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছেন, তা হ'ল রবীন্দ্রনাথ যে সব গ্রন্থ নিজে পরিকল্পনা করেছিলেন, যে ভাবে তাঁর রচনার বিন্যাস করেছিলেন তা বদলে দিয়ে সুষ্ঠ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কোন কোন

গ্রন্থ "ইমপ্রুভ" করা দরকার। এই মহান কার্যের প্রথম উদাহরণ 'ছিন্নপত্র' নামক গ্রন্থটি।

১৩১৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্র' প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীতে (১৫ খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের নামসূচীতে ছিন্নপত্র নামে কোন গ্রন্থের উল্লেখ নেই, আছে 'ছিন্নপত্রাবলী'—নামক গ্রন্থের নাম। পাদটীকায় বলা হয়েছে এই গ্রন্থটি "ছিন্নপত্র নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তারই পরিবর্তিত রূপ"। কে এই "পরিবর্তিত রূপ" সৃষ্টি করলেন? রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থটি পরিকল্পনা করেছিলেন ত বদলে দিলেন কে? কোন যুক্তিতে? বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত "ছিন্নপত্রাবলী"-গ্রন্থে প্রকাশক জানিয়েছেন "এই গ্রন্থে পূর্বপ্রকাশিত 'ছিন্নপত্র'-সমূহেরও পূর্ণতর পাঠ পাওয়া যাইবে।" ছিন্নপত্র সমূহের পূর্ণতর পাঠ পাওয়া অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু সেই পাঠ পরিশিষ্টে দেওয়া যেত না কি? সম্পাদকীয় সংযোজনরূপে তাদের চিহ্নিত করলে কি ঠিক হ'ত না? যে কোন গ্রন্থের কাঠামো কি সম্পাদক বা প্রকাশক খুশিমত বদলে দিতে পারেন? যদি আজ 'গীতাঞ্জলি' থেকে দশটা কবিতা বাদ দেওয়া হয়, কিংবা দশটা কবিতার ক্রম পাল্টে দেওয়া হয় এবং অন্য কয়েকটা কবিতা গীতাঞ্জলিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি কোন অন্যায় হয় না? আমরা কি মেনে নেব যে একজন লেখক যেভাবে গ্রন্থ পরিকল্পনা করেন, যেভাবে গ্রন্থের মধ্যে তাঁর কবিতা বা প্রবন্ধ সাজান সেটা নিতান্তই যান্ত্রিক ব্যাপার, সেটা বদলে দিলে কোন ক্ষতি হয় না? আর গ্রন্থের নাম বদলে দেওয়াটাও সম্পাদকের অধিকারভুক্ত! ছিন্নপত্র নাম রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। ছিন্নপত্রাবলী নামটি কে দিয়েছেন? 'গোরা' উপন্যাসের নাম 'গৌরমোহন' রাখলে কি ক্ষতি হয়?

ছিন্নপত্রে ছিল ১৫২টি চিঠি। ছিন্নপত্রাবলীর চিঠির সংখ্যা ২৫২; ছিন্নপত্রের প্রথম আটটি চিঠি ছিন্নপত্রাবলীতে নেই, আর ছিন্নপত্রাবলীর ১০৭টি চিঠি ছিন্নপত্রে নেই। যে যুক্তিতে ছিন্নপত্রাবলী ছিন্নপত্রের রূপান্তরিত সংস্করণ, সেই যুক্তিতে শিশুভোলানাথকে শিশু-র সঙ্গে জুড়ে দিয়ে (এবং শিশু-র যে সব কবিতা বিশ্বভারতীর সম্পাদকদের মনে হবে ঐ কাব্যে থাকা উচিত নয় সেগুলি বাদ দিয়ে) শিশু-র একটি রূপান্তরিত সংস্করণ প্রকাশ করা যেতে পারে।

আর একটি গ্রন্থের দিকে তাকানো যাক। গ্রন্থটির নাম 'ছন্দ'। ১৯৩৬ সালে গ্রন্থটি প্রথম ছাপা হয়, বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর একবিংশ খণ্ডে এই গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থটির একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত

হয়েছে—নতুন সংস্করণটি প্রস্তুত করেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, ছন্দ আলোচনায় তাঁর যোগ্যতা তর্কাতীত। তাঁর সম্পাদনা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই পরিবর্ধিত ছন্দ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থ নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' আরম্ভ হয়েছিল 'ছন্দের অর্থ' প্রবন্ধ দিয়ে। পরিবর্ধিত 'ছন্দ' গ্রন্থ শুরু হচ্ছে 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' প্রবন্ধ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থটি লিখেছিলেন, প্রবন্ধগুলিকে যে রীতিতে, যে ক্রমে সাজিয়েছিলেন, এখন তা হবে সাহিত্যের পুরাতত্ত্ববিদের আগ্রহের সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথের নামে যে পরিবর্ধিত গ্রন্থটি এখন আমরা দেখছি তা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন নি। প্রবোধচন্দ্র সেন যা করেছেন তা হল রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বিষয়ক আলোচনার কালানুক্রমিক সঙ্কলন। তার মূল্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে 'ছন্দ' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল তার গঠন ও বিন্যাস পদ্ধতির পরিচয় এখানে সম্পূর্ণ লুপ্ত।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাষা, শিক্ষা, সংগীত, রাজনীতি যে কোন বিষয়ে চিন্তাভাবনার কালানুক্রমিক সঙ্কলন যত ইচ্ছে প্রকাশ করুন—কিন্তু তাঁরা বলুন যে এগুলি রবীন্দ্ররচনার সঙ্কলন, এই সব সঙ্কলনের পরিকল্পনা বিশ্বভারতীর, রবীন্দ্রনাথের নয়। আর রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিকল্পিত গ্রন্থের কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের লোভ থেকে তাঁরা প্রতিনিবৃত্ত হ'ন। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সংখ্যা একদিকে যেমন বাড়তে থাকবে, আর একদিকে রবীন্দ্ররচিত গ্রন্থগুলি ক্রমশই পুনর্বর্ধিত এবং পুনর্গঠিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

শিশিরকুমার দাশ

প্রবন্ধ

দর্পণে বাঙালী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বাঙালীর বড় দুর্দিন রে ভাই! দাদাঠাকুর কি ত্রৈলোক্য বাবু হলে প্রবন্ধ শুরু করতেন এই ভাবে, বাঙাল কাঙাল ম্যান। বাঙালী দেউলে। লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি যতই কর ইয়ার (হিন্দী চাপানোর চেষ্টা চলছে তাই আগে ভাগেই শব্দটা ব্যবহার করে রাখি) পায়ের তলার জমি সরে গেছে। উই আর অল ফ্যালফ্যালানন্দ (ইংরেজীটাকেও রাখি) উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, চালচলনে, চিন্তায় ভাবনায়, সংস্কৃত, সংস্কৃতিতে, শিল্পে, ধর্মে, কৃষ্টিতে জাগরণের যে জোয়ার বাঙালী এনেছিল এবং তটপ্লাবী যে জোয়ারে সারা ভারত ভেসে গিয়েছিল তাতে এখন ভাঁটার টান বললে ঠিক বলা হবে না, বলতে হবে মজে গেছে। চরে বসে নিউ জেনারেসান এখন ফ্রাইং ভেরেণ্ডা। সেই জাগরণের ভগীরথরা এখন পোর্টরেট, দেওয়ালে ঝুল মেখে ধূসর বর্ণে প্রলম্বিত। আমরা উত্তরপুরুষরা তো অকৃতজ্ঞ নই, মৃত্যুদিবস আর জন্মদিবসে বছর ঘুরলেই একটি করে রজনীগন্ধার মালা ঝুলিয়ে দিয়ে পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ করছি।

সেই সময়টায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালীর একচেটে আধিপত্য ছিল। আধিপত্যের অহঙ্কারও ছিল। গোখেল আবার বলেছিলেন, হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টোডে ইণ্ডিয়া থিংকস টুমরো। ব্যস আর যায় কোথায়। আমাদের লেজ মোটা। মাথায় ঢুকলো ভারতবর্ষ মানেই বাঙলা আর বাঙালী, বাকি সব গণ্ডায় এণ্ডা মেলানো গোছ।

গোখেল দেহ রেখেছেন। আর যে কবি গান বেঁধেছিলেন, 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে যে দেশ সকল দেশের সেরা', তিনি এই সেরা দেশের হাল দেখার জন্যে আর জীবিত নেই। আমরা এখন কোটেশান

গলায় ঝুলিয়ে পশ্চিমবাংলা নামক এক আধখাওয়া রাহুগ্রস্ত দেশে কোনোরকমে অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছি।

বাঙালীর বোধহয় এইটাই উপযুক্ত প্রাপ্য। বাঙলার আর এক কবি (যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। সাহিত্যে এই উচ্চ স্বীকৃতি এদেশের আর কেউ পাবেন কি!) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি'। ঠিক তাই। আমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের একটা বড় কারণ, আমরা সবজান্তা। আমরা যা নই তাই ভেবে গাল গলা ফুলিয়ে কাণিসে গোলা পায়রার মত বক বকম করতে করতে গোল হয়ে ঘুরি। আমরা নাকি ভীষণ ইনটেলেকচুয়াল, মননশীল, ভয়ঙ্কর রিফাইনড একেবারে বালাম চাল। ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের মেজাজের ভীষণ মিল (প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন) তবে আর কি! আমরা হঠাৎ লাফিয়ে উঠি তারপরেই ঝিমিয়ে পড়ি। এই আমাদের ধরন। বাঙালী চরিত্র ক্লাসিফায়েড। আড্ডায় আমরা ভীষণ ওস্তাদ ঠিক ফরাসীদের মত। তারপরই সহজ লজিক্যাল ডিডাকসান, যেহেতু ফরাসীরা একটা জাতের মত জাত আমরাও তাই, আমাদের কোনো তুলনা চলে না। আমাদের সব গেছে, যেতে দাও, তবু মরা হাতি লাখ টাকা। আগেকার দিনে, কোনো কোনো বাঙালী দু একটা বাঘটাঘ মারতেন, কাথবার্টসন হার্পার সে সব স্টাফ করে দিত, বাবুদের বৈঠকখানায় মরা বাঘ দাঁত বের করে শোভা বাড়াত। বাবুর বীর্য গায়ে মেখে অহঙ্কার গড়িয়ে দিত। বর্তমান বাঙালীদের অনেক সময় স্টাফড বলেই মনে হয়, একসময় প্রাণ ছিল, লাঙুলের আস্ফালন ছিল, এখন মৃত। একসময় বাঙালী বাঘ শিকার করত এখন বাঙালীকে শিকার করা হয়। বাঙালী রাজনীতির সবচেয়ে বড় শিকার, দারিদ্র্যের শিকার, নিরক্ষরতার শিকার, প্রাদেশিকতার শিকার। সমস্ত সম্মান কেড়ে নিয়ে তার ঘাড়ে ঘৃণার বোঝা স্তূপীকৃত। নিজের এলাকার বাইরে পা রেখেছো কি হাতি খেদার মত বাঙালী খেদা শুরু হবে। বাঙালী এখন অন্যপ্রদেশের চক্ষুশূল। ওরে আমার ইনটেলেকচুয়াল! ইংরেজের খয়ের খাঁ। অনেক ছড়ি ঘুরিয়েছো এইবার কিঞ্চিৎ শিক্ষাগ্রহণ কর। নিজ বাসভূমে হও পরবাসী।

বাঙালীর রক্তে হিমোগ্লোবিনের মত মিশে আছে একটি ধারণা, আমি প্রভু তুমি দাস। তোমার শরীর আছে, তাগদ আছে, সব আছে, আমার আছে ব্রেন। এমন ব্রেনি চ্যাপ আর কোন্ প্রদেশে পয়দা হয়েছে। নিজের দেশে সবসময় খবরদারি সম্ভব ছিল না। গেঁয়োযোগী ভিখ্ পায় না। এক সময় বাঙলার বাইরে

বাঙালীদের বড় বড় কলোনী ছিল। বড় ছোটো চাকরি বাঁধা ছিল। ভুল হোক শুদ্ধ হোক দু'কলম ইংরেজী বাঙালী লিখতে পড়তে পারতো। আই হ্যাভ বললেই চাকরি আটকায় কে। এই সব কলোনিয়াল বাঙালী মনে করতেন আমি ছাড়া সকলেই বুদ্ধু। স্বাধীন ভারতে চাকা গেল ঘুরে। বাঙালী দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, কি আর হবে ভাই, এখন যে ওদেরই রাজত্ব। আমাদের সুভাষ নেই, বিপিনচন্দ্র নেই, রাসবিহারী নেই, শ্যামাপ্রসাদ নেই। গবরমেণ্টে হামারা কোই নেই। ছাতুর চাপে ভেতো বাঙালী বড় বেকায়দায়। ক্ষমতার ভ্রাক্ষা ফল বড় খাট্টা। শৃগালের এর চেয়ে বড় যুক্তি আর কি আছে। এরপর বাংলা ভাষা! খণ্ডিত বাঙলার বাইরে বাংলা ভাষার কোনো কদর নেই। হিন্দির স্টিম রোলার হই হই করে চলেছে। মার খাচ্ছে বাংলা সাহিত্য, বাংলা চলচ্চিত্র। চাকরি খুঁজতে গিয়ে বিপদে পড়ছে বাঙালী ছেলে। এরপর ভাষার প্রশ্নে ভারত যদি বাইশ টুকরো হয় খেল আরো জমবে। এদেশের বেশীরভাগ আন্দোলনের কোনো মাথা-মুণ্ড নেই। ভাষা নিয়ে যদি একটা সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি শুরু হয়ে যায় আমাদের একটা কাজই করার থাকবে, চাদর বেঁধে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে কোরাসে দুলে দুলে গাইবো—আ মরি বাংলা ভাষা মোদের গরব মোদের আশা।

বৃটিশ ভারতের স্থয়ো রাণী বাঙালী আজ দুয়ো রাণী। বাঙালীর দাপট বাঙলা দেশেই অসহ্য, সীমানা পেরোলে তো কথাই নেই, কুষ্ঠ রোগীর সম্মান অপেক্ষা করে আছে। ট্রেনে চেপেছে বাঙালী। বাঙলার সীমানা পেরোলেই এতক্ষণ ভিজে বেড়ালের মত বসে থাকা অবাঙালী সহযাত্রী গোঁফ চুমড়ে, ল্যাজ ফুলিয়ে ফ্যাঁস ফোঁস শুরু করলেন। বঙ্গ সন্তানকে আসনচ্যুত করার স্পিরিট হাওয়ায় ভাসছে—ইয়ে বাঙাল নেহি, বিহার হায়, ইউ. পি হায়, ওড়িশা অছি। বঙ্গমায়ের সন্তান তখন বড়ই অসহায়। পুরীর সমুদ্র সৈকতে বাঙালীর কাছা খুলে দেবার স্বাস্থ্যকর চেষ্টা। ইউ. পির পাহাড়ে বাঙালীর হেনস্তা। বাঙালীর তখন একমাত্র সহায়, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম সব কো সন্মতি দে ভগবান। সুযোগ আসবে ফিরতি পথে। সীমানা পেরিয়ে যেই ট্রেন ঢুকল সুজলাং সুফলাং পশ্চিমবঙ্গে তখন সুদ-সমেত রামের অপরাধ শ্যামকে ফিরিয়ে দোবো, দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে। মার্কটোয়েন জীবিত থাকলে মেকসিকান ফিউয়েডের মত ইণ্ডিয়ান ফিউয়েড নিয়ে মজার একটা কিছু লিখে ফেলতেন।

বাঙালীর গণ্ডী এখন একফালি পশ্চিমবঙ্গ। স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বিপুল জনসংখ্যা। পূর্ববঙ্গ থেকে ঝেঁটিয়ে বাঙালী বিদায়। সুজলাং সুফলাং অঞ্চলটি

হাত ছাড়া হল। হাতে এল বর্ধমান লোকবল। বাসস্থান নেই, চাকরি নেই। আছে রাজনীতি, পরিকল্পনা, বক্তৃতা, আন্দোলন মিছিল। সমস্যা আছে, সমাধান নেই। ধৈর্য আছে, পড়ে পড়ে মার খাবার মুরোদ আছে। আর আছে ফ্রাসট্রেশান। ইনটেলেকচুয়াল পাকিনসনিজম। হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। নস্টালজিয়ায় ভুগছি সবাই। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চরমে। মারো ঠেলা হেঁইও, আওর থোড়া হেঁইও। ওপরদিকে ওঠার পথ বন্ধ, দু'পাশ চাপা। খোলা আছে নীচের দিক সুনীল বে অফ বেঙ্গল।

প্রেমে আর রণে কোনো নীতি নেই। আদর্শ, মূল্যবোধ সে তো স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত। রণনীতি সব সময়েই আলাদা। নিজে বাঁচলে তবেই তো পিতার নাম। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। সবই যখন নলিনী দলগত তখন ভ্যালু ভ্যালু করে লম্ফঝম্ফ করে কোন উল্লুক। প্রেজেণ্টটা সামলাও, ফিউচার ফেস করুক পরের জেনারেশন। আমি ততক্ষণে ছুরি মেরে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ল'ইয়ার হই। ঘুসের টাকায় মাল মেরে পড়ে থাকি। দেশ জননী! তুমি মা একটু চোখ বুজে থাকো। আমরা একটু অপবিত্র করে যাই। পবিত্র করার জন্যে এ সেকেণ্ড চৈতন্য উইল কাম। আমরা জগাই মাধাই না থাকলে তিনি উদ্ধার করবেন কাকে! লীলাটা যে জমবে না তাহলে!

জীবিকার প্রশ্নই এখন সবচে বড় প্রশ্ন। দুশো বছর ধান্দাবাজি করে এখন রামপ্রসাদ সেন, মন রে কৃষি কাজ জানো না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনেক আগে বাবা বাছা করে রাইটার্স বাঙালীকে বলেছিলেন, 'বাবারা ব্যবসা করতে শেখো, শিল্প টিল্প গড়ে তোলো। তা না হলে অচিরেই তোমাদের বারোটা বাজবে। উকিল, ডাক্তার ও কেরাণী এই নিয়ে জাতি টে'কেনা।' তাঁর এই আবেদন ও সতর্কবাণীর ফল হল উল্টো বুঝলি রাম। শিল্প গড়ে উঠল ঠিকই তবে সে শিল্প হল অলঙ্কার শিল্প, কেশ বিন্যাস শিল্প, চলচ্চিত্র শিল্প। মোড়ে মোড়ে, পাড়ায় পাড়ায় গহনার দোকান। বাঁকে বাঁকে সেলুন স্ব স্টাইল, আর ঘাড়ে ঘাড়ে বাবরি বিলাস। রুক্ষ রুক্ষ ইনটেলেকচুয়াল জটা। ব্যবসা করার অনেক ঝামেলা দাদু। ব্যবসাদার মাত্রেই ডিজঅনেস্ট। আমাদের মর‍্যাল কাঠামোয় বাধে। তাছাড়া আচার্যর কথা ফেলি কি করে— ব্যবসায়ে চাই কি? চাই ধৈর্য, চাই সাধুতা। আরম্ভ সামান্যভাবে হবে বটে, কিন্তু এই সামান্যের মধ্যে সফলতার বীজ নিহিত আছে। একেবারেই কেহ খুব বড় হয়ে উঠতে পারে না; আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া সম্ভব নয়; বড় ব্যাকডেটেড মেথড। পেট ফুলে রাতারাতি ভুঁড়ি বড়বাজার

থেকে ব্যবসার এই নতুন নীতি আমরা শিখেছি। প্রথম স্টেপ হোর্ডিং, দ্বিতীয় স্টেপ স্কেয়ার্সিটি, তৃতীয় মূল্যবৃদ্ধি, চতুর্থ ব্ল্যাক মানি, পঞ্চম রাতারাতি লাখোটিয়া, কোটিমল কেজরিওয়াল। বাঙালীর ছেলের ক্যাপিটেল কোথায়! লাখলাখ টাকা চাই, সুদৃশ্য অফিস চাই, ফ্যান চাই ফোন চাই। তার মানে সাতমন তেলও পুড়লো না, রাধাও নাচল না। বড়জোর একটা স্টেশনারী দোকান করা যেতে পারে। বেশ সেজেগুজে কাউণ্টারে বসে থাক। বাজার যা কটা লোকই বা খুচরো জিনিস কিনবে? তারচে দাঁড়িয়ে পড় এমপ্লয়মেণ্ট একস্চেঞ্জের অনন্ত লাইনে। একটা যদি চাকরি জোটে, তার চে মহাভাগ্যবান কেবা আছে! মহা ধুমধাম। সত্যনারায়ণ, সিন্নি, সানাই, ব্যাগ পাইপ। আর যদি না জোটে, রাজনীতির রিক্রুটমেণ্ট অফিস খোলাই আছে, ইয়ার্ডে ওয়াগন আছে, হাতে ক্রো বার আছে, ক্রিমিন্যাল অ্যালায়েন্স আছে। 'ঠাকুঝি্য জীবন এত ছোটো ক্যানে?' স্বল্পং যখন আয়ু .তখন দুলকি চাল চলবে না। কুইক মার্চ টু 'ল্যাখডাম'। রেসের মাঠে ঘোড়া ছুটছে। পথের বাঁকে বিজ্ঞাপন আছে—উইকলি, কুইকলি, লাকি ল্যাখ।

আচার্যর উপদেশ বাঙালী শোনেনি। যারা শুনেছে পশ্চিম বাংলার শিল্প অর্থনীতিতে তাদেরই আধিপত্য। বাঙালীর দুষ্ট সরস্বতী সেখানে কয়েকশো টাকার বাঁধা মাইনেতে বিকিয়ে আছে। বাঙালী চিরকালের চিনির বলদ। বাঙালী দালালি করবে। একনম্বর, দুনম্বর হিসেবের খাতা ঠিক রাখবে। কেমন করে কায়দা করে ডান হাত বাঁ হাত এক করে তাল মাফিক লাইসেন্স বের করতে হয়, কাঁচা মালের কোটা আদায় করতে হয় বাঙালী জানে। বাঙালী চোখ মেলে দেখতে জানে কোথাকার মাল কোন সুড়ঙ্গপথে কোথায় গিয়ে কার ঘরে লাভের গুড় জমা করে, গাড়ির পর গাড়ি, বাড়ির পর বাড়ি করে। কলকাতার তিনের চার অংশে যাদের রাজ্যপাট, সুখের কথা তারা বাঙালী নয়। বাঙালীর সামনে বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধি হলে আঁতে বড় ঘা লাগে, বুকটা জলে যায়। লক্ষ্মী অন্য ঘরে থাকুন ক্ষোভ নেই বাঙালী কিন্তু বেঁড়ে শেয়াল হয়ে থাক। একটা ল্যাজও যেন চামরের মত ঝুলে না থাকে!

বাঙালীর অ্যালায়েন্স অর্থনীতিতে নয়, বৈষয়িক ব্যাপারে নয়। সাময়িক জোট গড়বে, বিচিত্রানুষ্ঠানে, বারোয়ারী পূজোয়, সখের থিয়েটারে। মাঝে মধ্যে সমাজ সেবার ঝোঁকও চাপতে পারে। বস্তি উদ্ধার, নাইট স্কুল, উদ্ধার আশ্রম, হরিসভা, অষ্টপ্রহর। বৃহৎকে বৃহতেরা ধরুক! বাঙ্গালী ক্ষুদ্রকে নিয়েই মশগুল। ফ্রাসট্রেশানের এই তো লক্ষণ। বড় বড় ব্যাপার থেকে সরতে সরতে বারোয়ারী

পুজো কমিটির মেম্বার, সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট। অঙ্কুরের পোজ নিয়ে দুর্ভাবনায় অস্থির। বিসর্জনের মিছিল সাজাতে প্রতিবেশীর গলায় গামছা দিয়ে চাঁদার ধান্দা। মিছিলে বাঙালী পাছা দুলিয়ে নাচতে নাচতে নিজেদেরই শবাধার বহে নিয়ে চলেছে, আগে চলে ল্যাংচা ঘোড়া, তারপরে উপবাসী হাতী তার পেছনে মহরমের তাসা তাক কুড়কুড়, তাক কুড়কুড়, তাক কুড়ু কুড়ু, কুড়ু কুড়ু। কুরে কুরে বাঙালীকে খাও। এরপর জলসা। সংগীতের শবের ওপর আধুনিকের সাধনা। আনুনাসিক কণ্ঠে তুমি আসবে বলে দোলা লাগল মনে। এই জিনিস বের করতেই ছাপান্ন টাকার লাল জল পেটে ঢেলে বিখ্যাত গায়ক ন্যাসপাতি মেরে স্টেজে উত্তর দক্ষিণ ভোলা। তরুণের বুক চাপড়ে আবৃত্তি, ওরে বিহঙ্গ, রে বিহঙ্গ। এদিকে মন বিহঙ্গ কবে দানাপানির অভাবে শুকিয়ে মরে গেছে।

বাঙালীর ক্যাপিটাল দু' জায়গায় দরাজ—বন্ধকী কারবারে, যে কোনো নির্বাচনে। মিউনিসিপ্যালিটি, সমবায় সমিতি, স্কুল, লাইব্রেরী কমিটি। যে কোনো একটা জায়গায় জনসেবার একটু সুযোগ দাও মা ভাগ্যলক্ষ্মী, তারপর আমি ফাল হয়ে ফালা ফালা করে বেরিয়ে আসি। এরপর আমার পালে চালু রাজনীতির বাতাস যদি ধরতে পারি তাহলে প্রমাণ করি আমি বাঙালী, বঙ্গ আমার জননী আমার আখ চেবানো করে চেবাই।

বাঙালী আপরাইট। বড় অন্যায় আমার প্রতিবাদের বাইরে। আমি তো শের নই শৃগাল। আমার লাঠালাঠি বাসে ট্রামে, পাড়ার রকে, গৃহে, প্রতিবেশীর কলতলায়। বৃহৎ আমাকে মাড়িয়ে ছাতু করে দিক, নো হার্ম; কিন্তু তুমি হরিপদ অসাবধানে বাসে আমার পা মাড়াবে কেন? দুই হরিপদে ঝটাপটি, লটাপটি। দলাদলি, মন কষাকষি। এ ওর পেছনে উদ্যত দণ্ড। আয় তোকে আছোলা দি।

আসছেন যাঁরা বা ইতিমধ্যে দৃশ্যপটে যাঁরা এসে গেছেন তাঁরা বুঝেই গেছেন বাঙালী ভগ্ন দেউলের পাকসাট খাওয়া চামচিকি। লেখাপড়া, শিষ্টাচার এক ধরনের মানসিক দুর্বলতা। ইনস্টিট্যুশান সব ভেঙে ফেল, কোড পাল্টে ফেল। সাধনা নয়, সিদ্ধি চাই। অর্জন নয় ছেনতাই। সারা দেশ জোড়া এই পিগারিতে একটু দাঁতাল, একটু মাতাল না হলে রেসপেক্ট কোথায়। প্রেম বিলিয়ে ছিলেন পাঁচশো বছর আগে নদের চাঁদ, আমরা সোনার চাঁদ নই, ধারালো লোহার চাঁদ ভয় বিলোই। আমরা মৃত্যু, আমরা ঝঞ্ঝা, নিজেরে ছাড়া কাহারে করি না কুর্নিস।

বর্তমান বাঙালী সমাজ এক বিচিত্র ঐক্যতান। যাঁদের যাবার সময় হয়েছে তাঁরা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে পাকা চুল নেড়ে, গেল গেল

করছেন। সার্বোনিয়ান বগে দেশ ডুবছে। ওরে সূর্য বুঝি আর উঠবে না। এঁরা হলেন অর্কেস্ট্রায় বেহালার সুর। আর একদল বলছেন, চুপ রহো, স্টিয়ারিং আমার হাতে এই দেখ না চলছে গাড়ি সোজা রাস্তায়। আমরা এই ননসেনস্‌দের ভাগ্যবিধাতা। আমাদের হাতে যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র। কল্পনা, পরিকল্পনা। আমরা চক্র, আমরা চক্রী। আমরা ব্রাউন সাহিব। আমাদের তকমা আছে, গমক আছে, ঠমক আছে। আমাদের হিপড্যানস তোমাদের দেখতেই হবে। এর মধ্যমণি সেই সব মেটিরিয়ালিস্ট। মরগে যা তোরা আমার কি! শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। একটু তেল দি, একটু ঝাল দি, একটু তেলা হই। দেশ তো জড় পদার্থ। নশ্বর এই দেহ। জাল ফেলে জেলে বসে আছি তীরে। আমরা তৈল বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, বাঙালীর শরীর তেলে আর জলে। তৈল এক প্রকার স্নেহ জাতীয় পদার্থ। তুমি আমাকে স্নেহ কর, আমি তোমাকে স্নেহ করি। একটু এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই।

শেষ বাঙালী যেদিন হেসে কলকল গেয়ে খলখল তালে তালে তালি দিতে দিতে নিজের এপিটাফ গলায় ঝুলিয়ে সরে পড়বে, সেদিন একবার পোস্ট মর্টেম করে দেখা যেতে পারে বাঙালী মগজের স্বরূপ। নব বেদান্তের শেষ কথা—বাঙালীকে জানো তাহলেই তোমার সব জানা হবে।

ব্যক্তিগত রচনা

আগুনের মতো লাল, লাল, গোলাপের মতো

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

বসবাস করার এই সুন্দর জীবনে আমরা সবাই যে-দিকে তাকিয়ে ভয় পাই তুষার সেই দিকেই ছুটে গেছে বারবার, সেই শ্মশানের দিকে। জীবনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, উৎখাত হয়ে সকলের অলক্ষ্যেই তুষার বেছে নিয়েছিল আত্মহননের পথ। অথচ বুকের মধ্যে ক্লান্ত অক্সিজেন হাঁসফাঁস করেছে যখন, তখনও তুষার সকলকে বোঝাতে চেয়েছে কি দারুণভাবে বেঁচে আছে সে। এই চোরামির খেলায় কেন মেতেছিল তুষার তার একটিই কারণ হতে পারে। ব্যবহারিক জীবনের কাছ থেকে তার পাওনার শূন্য অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে এত জোরে হেসে উঠেছিল তুষার যে সে-হাসির গমকে তার চোখ বেয়ে জল নেমে আসছিল। তুষার তাই হাসি থামিয়ে অশ্রু সংবরণ করেছে আর ভেজা দু'চোখ লুকোতে গিয়ে আবার হেসে উঠেছে।

মৃত্যুর বাইশ দিন আগে তুষার শেষবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। জরাজীর্ণ বুকের খাঁচায় প্রাণপাখীটা ধুক্‌পুক্ করছে তখন। কাঠির মতো সরুসরু হাত-পা। হাত ও পায়ের পাতা ফোলা। পেটে জল, এমনকি হাড়ের মধ্যেও জল। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে বুড়োদের মতন। কোটরাগত চোখ দুটো তখনও এক অবাক বিস্ময়ের প্রকাশে ভাসাভাসা। বুকের ছবিতে দেখা গেছে দু-দিকে দুটো মৌচাক। রোগী যখন সব চিকিৎসার বাইরে তখনও ডাক্তারদের যেমন বলতে হয় তেমনি বলেছিল: "ভয় নেই, সেরে উঠবেন।" তুষার কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো তাকিয়েছিল তাঁদের দিকে, তারপর ধীরে কথাকটা গড়িয়ে দিয়েছিল: "কি বলছেন স্যার, ভয়! অনেক কষ্ট করে অনেক চেষ্টা করে এই অসুখটা নিয়ে এসেছি আমার শরীরে, আপনারা সারিয়ে দেবেন!"

এর আগেও তুষার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল দুবার। একবার ডিগ্রির যক্ষ্মা হাসপাতালে আরেকবার ন্যাশানাল মেডিক্যালে। প্রথমবার, ১৯৭১ সালের শেষের দিকে, যখন ডিগ্রিতে ভর্তি হয় তুষার, তখনই অসুখটা এগিয়ে গেছে অনেকখানি। তুষার কিছুতেই স্বীকার করবে না যে তার কোনো অসুখ হয়েছে। একরকম জোর করেই তাকে ভর্তি করতে হয়। সে-সময়ে তুষারকে যাঁরা ভালবাসতেন—কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক—অনেকেই সাহায্য করেছিলেন। হাসপাতালে যাবার সময়ে আমি তুষারের সঙ্গী হই। সারাটা পথই গুম্ মেরে বসে থাকে তুষার। আমরা যেন ষড়যন্ত্র করে তাকে কলকাতার বাইরে একটা নির্বাসনে রেখে আসছি, এরকমই একটা ধারণা তার মনে মনে। এছাড়া, আফিম, ঘুমের বড়ি, মোদক, মাজুম, এ-সবের নেশা থেকে সে কিছুতেই মুক্তি নিতে চায় না। সুদূর ডিগ্রিতে নেশার অসুবিধে হবে ভেবেই তার সায় ছিল না সেখানে যাবার।

যাই হোক, প্রথমদিকে ডিগ্রির হাসপাতালেও তার নেশার অসুবিধে হয়নি। কিছু তরুণ বন্ধু তুষারের প্রয়োজনের করুণ আর্জিকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই মাঝেমাঝেই টাকা এসে যেত তার হাতে আর চোরা পথে নেশার উপকরণ। নেশা ও চিকিৎসা এক সঙ্গেই চলতে থাকে। চিকিৎসার সুফল ঘটতেও দেরি হয়। একদিন খবর আসে তুষারের ছোড়দার কিশোর ছেলেটি জলে ডুবে মারা গেছে। মৃত্যুর ইঙ্গিতটা আরেকবার মোচড় দিয়ে ওঠে তুষারের বুকের মধ্যে। তার 'ভাইয়ার' এই আকস্মিক মৃত্যু তাকে আরেকবার অবিশ্বাস ও অনাচারের মধ্যে ঠেলে দেয়। তাই চিকিৎসার মাঝপথেই তুষার পালিয়ে আসে ডিগ্রি ছেড়ে।

১৯৬৪ সালে তুষারের বাবা মারা যান। ধনী জমিদার বনবিহারী রায়ের এক সময়ে বার্ষিক আয় ছিল তিন লক্ষ টাকা। দেশবিভাগের পর হঠাৎ সব হারিয়ে যায়। অবস্থা পড়তে পড়তে এমন একটা জায়গায় পৌঁছয় যে অন্তিম সময়ে তিনি একটা ডাক্তার ডাকতেও দ্বিধা করেছেন।

জীবনের এইদিকে তাকিয়ে জীবন সম্পর্কে কোন মায়া ছিল না তুষারের। প্রচণ্ড অভিমানে ফোঁভে নিজের মৃত্যু দিয়েই তুষার জীবনকে হারিয়ে বাজিমাৎ করতে চেয়েছে। তার জমিদারী রক্তের মধ্যেই ছিল উড়িয়ে দেবার নেশা। কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে ওড়ানোর মতো কোনো কিছুই পায়নি সে। শুধু নিজের জীবনটাই ছিল উড়িয়ে ফতুর করার জন্য। তাই করেছে তুষার।

আমার মনে হয়, এই উড়িয়ে দেবার নেশা যাদের থাকে তারা জীবন থেকে

স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশী তাপ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু যতোই মত্ত হওয়া যায় এই নেশায় ততোই মনে হয় প্রকৃত সে-আগুন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই একেবারে ফতুর না-হলে নিস্তার নেই।

দ্বিতীয়বার হাসপাতালে ভর্তি হয়েও তুষার সেখানে থাকেসি বেশিদিন। তুষার চায়নি তার মরণ দূরাগত হোক। দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছি: "কি তুষার, মাম্বলি চেক-আপটা করিয়েছ?" তুষার হেসে জবাব দিয়েছে, "হ্যাঁ, করেছি। শুধু, রক্ত, এক্সরে, সব কিছুই নেগেটিভ। তোমায় কাল রিপোর্টগুলো দেখাবো।" তুষার বুঝতে পারে, আমি আদৌ বিশ্বাস করিনি। তাই সঙ্গে সঙ্গে যোগ দেয়: "মাইরি, কদিন ধরে শালা একদম পায়খানা হচ্ছে না। ভীষণ কনস্টিপেশন্। মরে গেলাম!"

ব্যবহারিক জীবনে তুষারের সমস্যা ছিল অনেক। খাওয়া-পরা ছাড়াও প্রতিদিনের নেশার জোগাড় চাই। অন্য কিছু না-করে শুধু কবিতা লিখে—কবিতার বই দু-একটা ছাপা হলেও, একটু আধটু নামধাম হলেও—আমাদের দেশে খাওয়া-পরার সংস্থান হয় না কোনো কবির। তুষারেরও হয়নি। তুষারকে তাই ঘুরতে হয়েছে কলকাতার পথেপথে, জীর্ণ মলিন দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এখানে সেখানে অলিতে গলিতে। খাদ্য জুটুক বা না জুটুক নেশা চাই-ই। আর নেশা জুটে গেলে খাদ্যেরও প্রয়োজন মিটে যায়। তাই তুষার কখনও রাজা উজির, কখনও ভাঁড়। কখনও সভা-কবি হয়ে মাতিয়েছে সকলকে, কখনও মুগ্ধ শ্রোতারা শুনছে চিত্রপরিচালক বলে যাচ্ছেন তাঁর মহান্ স্ক্রিপ্ট কাট্ বাই কাট্। আবার তুষার যখন ইণ্টেরিয়র ডেকরেটর তখন সে অনেককেই নেমতন্ন করেছে পার্ক হোটেলের বিশেষ পার্টিতে। ম্যাড হাউস থেকে আরম্ভ করে সমস্ত হোটেলের ফ্রেস্কো যার আঁকা বিশেষ পার্টিতে তার নেমতন্ন থাকেই। তা ছাড়া অবাধ অনুমতি থাকে দু-চারজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে যাবার। বিনিময়ে তুষার পেয়ে গেছে কয়েকটা টাকা। একটা কাটলেট কিম্বা একটা মাটন্ ওমলেট্, দু-এক কাপ চা কিম্বা কফি। তারপর তুষার উবে গেছে, তার সব ভক্ত ফ্যানেদের ফেলে; কেউ জানে না, কোথায়।

গোপন নেশার ডেরায় পৌঁছে গেছে তুষার। আরও একটু হলাহল চাই; আরও ছটা উন্মাদক বড়ি। একটা মাজুম দিন, মোদক এক পুরিয়া। মিথ্যার কোলাহল এখনও বুজগুড়ি কাটছে মাথায়! শুদ্ধ শব্দেরা কোথায়! নস্তি দিন

দশ পয়সার, দোক্তা চার আনার। ওটা কী টানছেন, গাঁজার বিড়ি! দিন, একটান দিই। আরে মশাই, আফিমের ডেলাটা আস্‌লি তো!

মধ্যরাত। শহর শাসন করে ফিরে আসছে তুষার! মাথা দিয়ে বেরুচ্ছে অনর্গল নীল ধোঁয়া। সবকটা চুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথার ওপর। শিরা উপশিরা, স্নায়ু পেশী রক্ত, হাড় মাস মজ্জা, হৃৎপিণ্ড পাকস্থলী ফুস্‌ফুস্ সোনা-গালানো এ্যাসিডের ক্ষারে পুড়ে, গলে ধূমায়িত হচ্ছে এক অপাপবিদ্ধ আত্মার অন্বেষণে। তুষার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে আসছে। একহাতে একটা কোয়াটার পাউরুটি আর একটু ভেলিগুড়, অন্যহাতে এক কাল্পনিক ঝুলিতে হরেক-রকম বাজি। তুবড়ি ফুলঝুরি বোমা হাউই চরকি রকেট রঙমশাল। সব মিইয়ে গেছে। বরফ ঢাকা এই কলকাতার পথে হাঁটতে হাঁটতে সব বাজিগুলি মিইয়ে গেছে তার।

তুষার ফিরে আসে ওর রোজকার বসবাস করার ঘরটাতে। ভূতাবিষ্টের মত সে ঐ অন্ধকার ঘরের এককোণে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ায়। একটু পরে একটা মিশমিশে কালো বেড়াল নরম থাবায় দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢোকে। তারপর এক তামাশার খেলা শুরু হয়।

সকালে দেখা যায়, ঘরের মেঝেয় বিছানায় দেয়ালে ছড়াছড়া রক্তের দাগ, আগুনের মতো লাল, লাল, গোলাপের মতো!

তুষারের জন্য প্রথম ও শেষ কটি লাইন

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সেই ঠিক পথ চেনে, পথ তাকে চেনেনি কখনো !
কে ছিল প্রকৃত খোলা সূর্যের কীর্তনে
আঁধারেও খেলেছিল নক্ষত্রের গোল্লাছুট খেলা
সব ঐ সাদা সাদা পাতা জানে—যা শুধু কাগজ
যার আক্ষরিক মরুভূমির আকাশে একদিন তারা উঠেছিল।
আজ তাকে চিনে নিল অবেলার ফুল
যেন ভুল, যেন বড় বেশী সাংঘাতিক ভুল করেছিল
নীলিমাউন্মাদ এক নেশার মানুষ !
তার কোনো রুমাল ছিল না, আমাদেরও চোখ মোছার প্রশ্ন ওঠে না
একটি নয়নও তাকে কোনদিন দিয়েছে কি কেউ ?
সে তবু সিগ্‌ন্যাল দিত, গেঞ্জির সমান হাল্কা
চামড়া টেনে খুলে নিয়ে সে শুধু সিগ্‌ন্যাল দিত
যেন কিছু দুঃখী মানুষ, অসুখী মানুষ
পাঁচ কিংবা পাঁচশোর মানুষ
পথ না চিনেও যেতে পারে
শব্দের জঙ্গল ছেড়ে স্তব্ধ বিজন কোনো চিরহরিৎ বাগানের দিকে !

দাও
আজ তাকে দাও কিশোরীর হাতে ঘষা প্রকৃত চন্দন
আজই তো বিবাহ ! শুধু ঐ স্থাণু মুখ থেকে আর
ফোটোগ্রাফিক স্মৃতিগুলি তুলে আনতে চেয়ো না ;
তাকে যেতে দাও
বহুদিন থেকেই তো সে খুব অনেক দূরে যেতে চেয়েছিল।

সম্পাদকীয়

১৯৪৭, পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা দুঃ—তারপরই সশব্দে খুতু ফ্যালে এক মাতাল ! আবার কখনো দেশ, বোধহয় ভঙ্গ বঙ্গদেশ নিয়ে চিন্তান্বিত এক ইনটেলেকচুয়ালকে ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে ভাবো, ভাবো, আর কিছু না হোক অন্তত ভাবা প্র্যাকটিশ করো। সমস্তক্ষণই ঐ মাতালকে যেন বিপুল এক শূন্যতা ঘিরে থাকে (মাতাল ওরফে নীলকণ্ঠ ওরফে ঋত্বিক ঘটক), তাই অনেক কথারই ইকো শোনা যায়, যেন কাছের পাহাড়, দূরের নদী, এমন কি গাছপালাও ঐ ভয়ংকর উজ্জ্বল উন্মত্তের কথার নিহিত বহ্নি সহ্য করতে না পেরে ফিরিয়ে দিচ্ছে, তাই এত প্রতিধ্বনি···

এবার শরৎকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঋত্বিকের "যুক্তি তক্কো আর গপ্পোর" মুক্তি। মুক্তি, না নিষ্ক্রমণ ? তবু তো যাবার আগে ঋত্বিক ঘটক আমাদের এই পূজাসংখ্যাপরায়ণ দেশ-কাল-বোধহীন পাঠক ও তার লেখকদের সম্মিলিত পাবণে দিয়ে গেলেন এক অবিস্মরণীয় চপেটাঘাত। শেষ দৃশ্যে আমাদের বাঙ্গালী চোখে ঢেলে দিলেন বোতলের শেষ তলানি মদটুকু, যা তিনি পুলিশের গুলিজনিত মৃত্যুর কারণে আর ব্যবহার করে উঠতে পারেন নি। সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই আমাদের চোখে স্বাধীনতার মদ, রাজনীতির মদ, আরো কত রকমের সুগম্ভীর পরিকল্পনার আসক্তিসমূহ, ঋত্বিক কি তার বোতলের শেষটুকু দিয়ে ধুয়ে দিতে চেয়েছিলেন ! বাঙালী এবং তার ভবিষ্যৎ—যেন ভবিষ্যৎ শব্দটির ওপরেই শেষ নিষ্ঠাবন ত্যাগ করে নীলকণ্ঠ ঋত্বিক তাঁর ছ'ফুটেরও বেশী আকাশের কাছাকাছি সুউচ্চ শরীর নিয়ে অন্তিম দৃশ্যে শুয়ে পড়লেন ঘাসে। ভাবতে ভাল লাগছে সরকারের অর্থানুকূল্যেই চিত্রটি নির্মিত। ভাবতে অবাক লাগছে কেন্দ্রীয় সরকার টাকাটা দিয়েছিলেন নাকি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীরই সুপারিশে ! এ ছবির অনেক জায়গাই আপাত অসংলগ্ন, কিছু দৃশ্য বর্জন করা

যেত কিনা তাও ভাববার! কিন্তু সব সময়ই শোনা গেছে এক প্রবল গর্জন, যাওয়ার আগে বাঙালীর জন্য শেষবার গর্জন করে গেলেন ঋত্বিক। কোনো উপন্যাস, কবিতা, গল্প নয়, "যুক্তি, তক্কো আর গপ্পোই" বাঙ্গালীর এবারকার শ্রেষ্ঠ শারদোপহার। সম্পাদকীয়তে এটা উল্লেখ করলাম, বা বলা ভাল, করতে বাধ্য হলাম কারণ মাতালবেশী ঋত্বিক যখন এত বছর পরেও ১৯৪৭, পনেরোই আগস্ট, ফুঃ! বলে ওঠেন, তখন প্রতিবাদ করতে গিয়েও দেখি একটি যৎসামান্য দৃঢ় লাইনও বুকের ভিতর গড়ে উঠছে না। তথাকথিত ইনটেলেকচুয়াল ও নেতাদের সমস্ত যুক্তি ও তর্ক সবই যেন পর্যবসিত এক মস্করাগল্পে। যে গল্প আগামী বংশধরদের কাছে কোনদিন করা যাবে না, অন্তত বাঙালী হিসাবে।

এ সংখ্যা প্রকাশের অল্প কিছুকাল আগে বিদায় নিয়েছেন নৃত্যগুরু উদয়শংকর। নৃত্যজগতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অনন্য। পৃথিবীর মানচিত্রে যে কজন স্বল্প সংখ্যক বাঙালী ভারতের জন্য চিরস্থায়ী অংশ জয় করে রেখে গেছেন উদয়শংকর তাঁদের অন্যতম।

ভারতীয় সঙ্গীত-জগতের অবিস্মরণীয় প্রতিভা ভীষ্মদেবও আর আমাদের মধ্যে নেই। এই দেবদুর্লভ কণ্ঠের অধিকারী মানুষটির সঙ্গে বর্তমান প্রকাশকের প্রাণের যোগ ছিল নিবিড়। এ সংখ্যায়, বোধ হয় বাংলাদেশে এই সর্বপ্রথম, ভীষ্মদেবের একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ রেকর্ড তালিকা (রেকর্ডনম্বর, রেকর্ড করার তারিখ, গানের প্রথম কলি, রাগরাগিণীর নাম, সুরকার, গীতিকার, ফিল্ম সঙ্গীত ইত্যাদি···) প্রকাশিত হলো। এর জন্য আমরা ভীষ্মদেবের পরিবার ও সংগ্রাহক গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রিয় তরুণ কবি তুষার রায় প্রায় নীরবেই গেলেন। এ সংখ্যায় তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের একটি স্মৃতিচারণা প্রকাশিত হলো।

গত সংখ্যায় আমরা শ্রদ্ধেয় দিলীপ গুপ্ত সম্পর্কে একটি বিশেষ রচনা প্রকাশের কথা ঘোষণা করেছিলাম। আগামী বছরের প্রথমার্ধেই দিলীপ গুপ্ত সম্পর্কে বিভাবের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তাই রচনাটি বিচ্ছিন্ন ভাবে এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো না।। এ সংখ্যা প্রকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন প্রদীপ দাশগুপ্ত ও শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের কাছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা।

উৎসবে আনন্দে

বাংলার রেশম

গরদ, মটকা, র-সিল্ক, বালুচরী ও সর্বপ্রকার রেশম বস্ত্রের জন্য

প্রাধিকারিক (রেশম)
ডাইরেক্টরেট অব সেরিকালচার
এণ্ড সিল্ক উইভিং

৩/১ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
(ফোন নং ২৩-২২১৪)

পশ্চিমবঙ্গ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগের
অনুমোদিত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারু-শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেডের পরিচালনায়
সুস্বাদু ও মুখরোচক খাদ্যপ্রাণ যুক্ত
"পাপড়"
শীঘ্রই বাজারে পাওয়া যাইবে।
খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

ঠিকানা:
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারু-শিল্প সমবায় সমিতি।
৮ বি, আর, এন, মুখার্জী রোড,
কলিকাতা—৭০০০০১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার কর্তৃক প্রচারিত।

BIVAV

Price Rs. 2.00
Vol. 2. Number 1

Special Autumn issue

July-September 1977
RN 30017/76

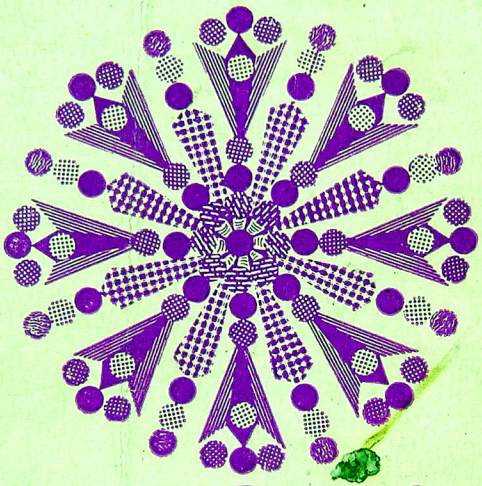

Renowned throughout the country for Flawless Reproduction

FOR PRINTING AND PROCESS BLOCKS ►

THE RADIANT PROCESS
CALCUTTA